
ভারতের
মুক্তিসাধক

ভারতের মুক্তি সাধনা

(১৭৭৬-১৮৮২)

সাধারণ সম্পাদক
ডঃ, শান্তি কুমার দাশগুপ্ত
অধ্যাপিকা, কৃষ্ণা কুণ্ডু
অধ্যাপক, অম্বিকা কুণ্ডু
অধ্যাপিকা, চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্ত
২৭, দেবীনিবাস রোড
কলিকাতা-৭০০০৭৪

প্রথম সংস্করণ ঃ
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৫

মূল্য ঃ দশ টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রী দেবযানী দত্ত

মুদ্রাকর ঃ
শ্রী ফাল্গুনী কুমার পাল
বাণীমালা প্রেস
৫৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র :

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে পর্তুগীজরা ভারতের মাটিতে পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের ইতিহাসে এক পরিবর্তনের যুগের সূচনা হয়। ভারতে ব্যবসা-ব্যণিজ্য করার প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে এই ভেবে ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগুলি এখানে আসতে থাকে। তারা মুঘল সম্রাট ও তাঁদের কর্মচারীদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ে ব্যস্ত হয়। মুঘলদের রমরমার সময়েই তারা, আসতে সুরু করে। এরপর যখন মুঘল সম্রাটরা দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নামে না হ'লেও কাছে স্বাধীন হয়ে পড়েন। এইসব প্রদেশগুলি খুব শক্তিশালী ছিল এমন নয় আর এদেশে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যও ছিল না। প্রাদেশিক নবাবদের দুর্বলতার সুযোগে এদেশে রাজ্য স্থাপন করবার সুযোগ পেয়ে যায় পর্তুগীজ, ফরাসী আর ইংরেজরা। বাণিজ্যের জন্য তৈরী করা কুঠিগুলিকে কেন্দ্র করে দুর্গও বানাতে থাকে তারা। বণিকের মানদণ্ড আস্তে আস্তে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হতে থাকে। আর ঐ তিন প্রধান ইউরোপীয়দের শক্তির একই উদ্দেশ্য থাকায় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এমন কি যুদ্ধও। আশ্চর্যের কথা যাদের রাজ্যের মধ্যে এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল তাদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে তারা তাদের দমন করবে। উপরন্তু এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে গিয়ে হেরে যেতে থাকে ভারতীয় রাজগণ। শেষে দেখা গেল প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে ইংরেজ।

এইরকম যখন অবস্থা—তখন বাংলা সুবা অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দি খাঁন মারা গেলেন দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লাকে

সিংহাসনে রেখে। কিন্তু এতে অসন্তুষ্ট হলেন সিরাজের মাসি ঘোসেটি বেগম, ঘোসেটির দেওয়ান রাজবল্লভ, নবাব সেনাপতি মীরজাফর, মহাজন জগৎশেঠ, বণিক উমিচাঁদ। স্থির হ'ল মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে আর চাওয়া হ'ল কলকাতার ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য ইংরেজ কোম্পানীর ইতিমধ্যে কলকাতায় ফোর্ট-ইউলিয়ম দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে সিরাজের অমতে। কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে ক্লাইভ যোগে দিলেন ঐ ষড়যন্ত্রে। যুদ্ধের প্রহসন হ'ল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে। ইংরেজ পক্ষ সিরাজকে হারিয়ে দিল। সেনাপতি রইলেন নিষ্ক্রিয়। মীরজাফর সিংহাসন পেলেন অনেক উপঢৌকন আর বাংলার নবাবের স্বাধীন অস্তিত্বের বিনিময়ে। এরপর চুচুড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন এই অজুহাতে মীরজাফরকে পদচ্যুত ক'রে তারই জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসালো ইংরেজ ভারতীয়দের অপদার্থতায়। বাংলার সিংহাসনটাও হয়ে দাঁড়ালো ইংরাজ বণিকের পণ্য সামগ্রী। যাই হোক, মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি ইংরেজদের বুঝতেন তাই সতর্ক ছিলেন। ইংরেজরা দিল্লীর মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা সুবায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার যে অধিকার পেয়েছিল, সেটা ভারতীয় বণিকের কাছে পরম ক্ষতি-দায়ক বলে মীরকাশিম সেই শুল্ক তুলে দেন। এতে ইংরেজ কোম্পানী গেল চটে। শুরু হ'ল মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ। মীরকাশিমের সঙ্গে যোগ দিলেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা আর বাদশাজাদা আলি-গৌহর যিনি কিছুদিনের মধ্যে দিল্লীর সম্রাট শাহআলম হলেন। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের বক্সারের যুদ্ধে ভারতীয় পক্ষ হেরে গেল। ইংরেজ বাংলার নবাব করলে বৃদ্ধ মীরজাফরকে। সুজাউদ্দৌল্লা বাধ্য হ'লেন ইংরেজকে কয়েকটি পরগণা আর টাকা দিতে। সব থেকে বড় পাওনা

আদায় হ'ল দিল্লী থেকে। বছরে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব বা খাজনা দেবার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানী হ'ল বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়কারী বা দেওয়ান।

১৭৬৫ সালের এই দেওয়ানী লাভ ভারতের ইতিহাসের গতিপথ একেবারে পালটিয়ে দিল। ইংরেজ কোম্পানী স্বাভাবিক ভাবেই বেশী রাজস্ব আদায় করতে চাইলো। তারা কৃষকদের সামর্থের কথা ভাবলো না। এদিকে রাজস্ব ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে থাকায় কোম্পানীর ক্ষমতা হয়ে গেল বেশী কিন্তু ক্ষমতাশীল নবাব রইলেন দায়ী শাসন কাজের জন্য। ইতিমধ্যে অনাবৃষ্টিতে ফসল না হওয়ায় এলো দুর্ভিক্ষ-ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর তার সঙ্গে মহামারী, কিন্তু কর্মচারীরা তাতেও রেহাই দিল না কৃষককে! ঐ সময় বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় হ'ল। ক্লাইভ সাহেব দ্বিতীয়বার গভর্ণর হয়ে বাংলায় এসে নবাবের হাত থেকে রাজ্য শাসনের দায়িত্বটুকুও নিয়ে নিলেন। শুরু হ'ল কোম্পানীর অর্থাৎ ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। নবাব রইলেন বৃত্তিভোগী হয়ে।

ইংরেজ কিন্তু এখানেই থেমে থাকল না। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় শাসকরা মূলতঃ ওদের দুর্বলতার কারণে আর ইংরেজদের সাময়িক শক্তির জন্য একের পর এক ইংরাজ কোম্পানীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়তে লাগলেন। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের নবাব এমন কি হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজের মিত্র হ'লেন। মহীশূরের টিপু সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্যাংশ গ্রাস করা হ'ল। একাংশ কোম্পানীর পছন্দমত-মহীশূরের পুরাণো রাজবংশের একজনকে রাজা করা হ'ল, অযোধ্যার দুর্বল নবাবরা যে কোম্পানীকে কত অর্থ আর সোনাদানা যোগাতে বাধ্য হয়েছিল তার হিসাব নেই। মারাঠারাও ঊনবিংশ

শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজের অধীনতা মূলক মিত্রতা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল। পাঞ্জাব প্রথমে ইংরেজের মিত্র ছিল পরে অধীন হ'ল।

অবশ্যই এসব একদিনে হয়নি। আর মনে রাখতে হবে শুধু রাজ্য শাসন ক'রে রাজা হ'লে ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য বিস্তার করেনি। কোম্পানী ছিল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। অপ্রতিহতভাবে একচেটিয়া বাণিজ্য চালাবার জন্যই ভারতে জমি দখল করা কোম্পানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ভারতের সুখ্যাত পণ্যসম্ভার হস্তগত করে রাখার জন্যই শাসনক্ষমতা হাতে থাকা দরকার। ভারতে বিশ্বখ্যাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য ইংরেজের হস্তগত হ'ল। প্রতিযোগী কেউ না থাকায় ভারতীয় উৎপাদকদের কমদামে তাদের কাছে পণ্য বেচতে বাধ্য করা হত। এই পণ্য কেনবার টাকা আসতো এ দেশেরই আদায় করা রাজস্ব থেকে। একে বলা হ'ত 'কোম্পানীর লগ্নী'। এ দেশের টাকা এদেশে লগ্নী করে লাভ করতো কোম্পানী। আর মনে রাখতে হবে এই রাজস্বের টাকা থেকেই এ দেশের শাসন, ব্যবসা চালানোর খরচা করা হ'ত, মাইনে দেওয়া হ'ত ফৌজী ও অন্যান্য কর্ম-চারীদের। এক পয়সাও ব্যয় হ'ত না এদেশের জন্য।

ভারতের নবাব, রাজ-রাজড়া ও অন্যান্যদের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ টাকা আর সোনা-দানা পেয়েছিল ইংরেজ কোম্পানীর লোকেরা সেটা চলে গেল ইংলণ্ডে। পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে মীরজাফরের কাছ থেকে তু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউণ্ড (৩৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা) পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা-বিহার থেকে ৯ কোটি টাকার মত উৎকোচ নিয়েছিলো। মীরজাফরের পত্নী মনিবেগম আর আযোধ্যার বিধবা বৃদ্ধা বেগমদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ ও গহনা-

পত্র আদায় করতে কুণ্ঠিত হ'ননি প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারত থেকে রাজস্বের টাকা, উৎকোচ বা লুঠ করা টাকা, অজস্র সোনা-দানা আর ব্যবসায়ের লাভের টাকা ইংলণ্ডে চলে যেতে লাগলো। শিল্পবিপ্লবের পরে ভারতের কাঁচামাল সস্তায় কিনে ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে তৈরী পণ্য এনে ভারতের বাজারে চড়া দামে বেচা কেনা শুরু হ'ল। জোর করে ভারতের কুটীর শিল্প, বস্ত্রশিল্প বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ভারতের সব সম্পদ চলে যেতে লাগলো ইংলণ্ডে। এই হ'ল অর্থনৈতিক শোষণ। ফলে ভারতে এল ঘোর দুর্দিন। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন কারিগর ও শিল্পীরা হয়ে পড়লো বেকার, জীবন তাদের হ'ল সমস্যা সঙ্কুল। গ্রামে জীবিকার সন্ধানে এ'ল তারা। কিন্তু আরও বড় সমস্যা সেখানেই রয়েছে।

রাজস্ব ব্যবস্থা একান্তভাবে শাসকের অনুকূল হওয়া দরকার। এটা তো আয়ের একটা বড় উৎস। তাছাড়া এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই তো দেশটাকে দাবিয়ে রাখতে হবে। ইংরেজের তৈরী করা ব্যবস্থা ভারতের সমাজ বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একেবারেই ভেঙে দিল। ভারতে ছিল অসংখ্য গ্রাম। এক একটা গ্রামকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে উঠত। গ্রাম-সমাজে জমির ওপরে সকলেরই অধিকার ছিল। সকলে মিলে মিশে চাষ করে ফসল ভাগ করে নিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস যেমন কাপড়, —গ্রামেই তৈরী করে নেওয়া হ'ত। গ্রামের প্রধানরাই শান্তিরক্ষা করতেন, ছোট ছোট বিচারও করতেন। শাসক রাজস্ব ধার্য করতেন গ্রামের ওপর, ব্যক্তিগত কৃষকের ওপর নয়। মধ্যযুগে রাজস্ব আদায়ের ভার থাকতো জায়গীরদের সুবাদারদের ওপর। গ্রাম-সমাজ থেকে জমিদার বা সামন্ত রাজারা রাজস্ব আদায় করে জমা দিতেন। এদের সঙ্গে গ্রামসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে এঁরা প্রজাদের সাহায্যও পেতেন।

দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজ কোম্পানী এই গ্রাম সমাজকে ভাঙতে শুরু করে, শাসন করবার জন্য তো বটেই, ইংলণ্ডের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও তৈরী পণ্য ব্যবসায়ের জন্য একাজ শুরু করা দরকার ছিল। ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য যে কারণে নতুন ব্যবস্থা হ'ল। কৃষকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হ'ল। রাজস্ব ব্যবস্থায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকল। মুঘল আমলের জমিদার বা রাজস্ব-আদায়কারী গোমস্তাদের বেশীর ভাগকেই জমির মালিক করে দেওয়া হ'ল। যেসব জায়গায় ঐ ধরণের কর্মচারী ছিলনা সেখানে নতুন আদায়কারী নিযুক্ত করা হ'ল। এই মালিকদের 'জমিদার' আখ্যা দেওয়া হ'ল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে খাজনা এরা কোম্পানীকে জমা দেবে। পরিবর্তে এরা হ'ল জমির মালিক। বলা বাহুল্য যতখুশী পরিমাণ রাজস্ব কৃষকের কাছ থেকে আদায়ের ক্ষমতা এদের হাতে রইল আর যে ক্ষমতার ব্যবহার করতে এদের কার্পণ্য ছিল না। জমিদার আর কৃষকদের মাঝে আবার গাঁতিদার, পত্তনিদার, দারপত্তনিদার, তালুকদার প্রভৃতি উপসত্বভোগীর জন্ম হ'ল। রাজস্ব আদায়ের প্রথম যুগে 'নাজিম' নামে কর্মচারীরা জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে আনত। এদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। এদের নামে সামান্য কৃষক তো বটেই জমিদাররাও ভয়ে অস্থির থাকত। ১৭৯৩ সালে ইংলণ্ডের মত জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ'ল। যাদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানী জমির বন্দোবস্ত করলো তারা হলেন জমির চিরস্থায়ী মালিক। মুঘল যুগেই একদল ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করতে শুরু

করেছিল। ইংরেজ আগমনের সময় থেকে এরা ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলে আর ব্যবসা চালায়। এই বিত্তশালী ব্যক্তিরা নিলামে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে জমিদারী কিনে নিয়েছিলো। ফলে এক নতুন জমিদার শ্রেণী তৈরী হ'ল যে শ্রেণী ইংরেজের সমর্থক ও সহযোগী।

এ ব্যবস্থার ফলে বহু পুরাতন জমিদার জমিদারী হারালেন। স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তাঁরা। এদিকে কৃষক হারালো জমিতে তাদের স্বত্ব। তাদের জমি থেকে উৎখাত করার অধিকার পেল জমিদার। খাজনার পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যান্য করের বোঝাও কম নয়। খাজনা যোগাতে গিয়ে বছরের ফসল যায় ফুরিয়ে। খাজনা না দিতে পারায় জমি থেকে উৎখাত করা হয় তাকে। এর ওপর কারিগর শ্রেণী গ্রামে চলে আসায় বেকার সমস্যা জট পাকাতে থাকে। সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে জমিদার আর নীলকর সাহেবরা যখন খাদ্য-ফসলের জমিতে পাট, তুলো, নীল প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল চাষ করতে বাধ্য করে কৃষককে। এতে তাদের লাভ হয়, জর্জরিত হয় কৃষককূল। গ্রামের তথা দেশের খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়ে। জিনিষপত্রের দাম দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। ঋণভারে পিঠ কুজ হয়ে উঠে একদা স্বাধীন কৃষকের।

ঋণ দেবার লোক আগেই গ্রামে গ্রামে করেছে। তারা হ'ল মহাজন ইংরাজ শাসকের আর পৃষ্ঠপোষকতা এদের ওপর। জমিদারের তো এরা সমপর্যায়ের।

এদের কাছে জমি বাড়ী বন্ধক রেখে চড়া সুদে ঋণ করে কৃষক যায় খাজনা মেটাতে বা খাদ্য সংগ্রহে। কিন্তু ঋণ শোধ করার সামর্থ এদের কোন দিনই হয় না। চক্রবৃদ্ধিহারে সে ঋণ বেড়েই যায়। মহাজনেরা অনেকে জমিদারীও কিনে নিতে থাকে। মহাজনদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে

গ্রামে ছড়িয়ে যায় ব্যবসায়ীর দল আর ঠিকাদার শ্রেণী। কৃষককে ঠকিয়ে ব্যবসা করাই এদের ধর্ম। স্বভাব-সরল আর নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক সমাজ সকলের কাছেই হয় নিষ্পেষিত।

এইভাবে ভারতে এক নতুন শাসন আর শোষণের যুগ সুরু হল। এর আগে ভারতে বিদেশী আক্রমণ বার বার হয়েছে। কিন্তু তাতে রাজনৈতিক পরিবর্তন হ'লেও ভারতের সমাজের কাঠামো প্রায় কিছুই বদলায় নি। কিন্তু ইংরেজ শাসন ভারতীয় সমাজের ভিত্তির ওপর কঠোর আঘাত হানে। অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। এমনকি ধর্ম-নৈতিক জীবনেও নানা ঘাত প্রতিঘাত চলতে থাকে।

এইসব রকমের শাসন ও শোষণ কিন্তু ভারতীয়গণ মুখ বুঁজে সহ্য করে থাকে নি। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিক থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষ বিদ্রোহ করছে। নিপীড়িত কৃষক সমাজই প্রথম বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরেছে। আদিবাসী সমাজে হয়েছে বিস্ফোরণ, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—সব দিকই হয়ে উঠেছে উত্তাল। এরপর এসেছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ যার পরে কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার চলে গেছে ব্রিটিশ রাজের হাতে। কিন্তু শাসন শোষণের চেহারা একই থেকে গেছে। বিদ্রোহের রথের চাকাও থেমে থাকে নি।

১ বঙ্গে কৃষক বিদ্রোহ

বাংলার স্বাধীন নবাব আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬) খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেও প্রতিটি জেলায়ই তার দেয় খাজনা দিত। সে সময় সমস্ত জেলার ওপর খাজনা ধার্য করা হতো। ব্যক্তিগতভাবে কোন কৃষকের উপর খাজনা ধার্য করা হতো না।

আলীবর্দীর পর নবাব হলেন তাঁর নাতি সিরাজদ্দৌল্লা। এ সময়ে দেশে আরম্ভ হ'লো নানা ধরণের গোলমাল এবং রাজ্য শাসনের অধিকার নিয়ে দেশের প্রধানদের ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রকারীরা সিরাজকে সরিয়ে সিরাজের আত্মীয় প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে কলকাতার কুঠিয়াল ইংরেজ ব্যবসাদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য চাইল। ভারতবর্ষের সমাজের অভ্যন্তরে তখন সর্বত্র বিরোধ। ইংরাজ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। নদীয়া জেলার পলাশীর মাঠে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যে সিরাজকে পরাজিত করে ক্লাইভের সেনারা। ষড়যন্ত্রকারীদের চাতুরীতে সেদিন বাঙালীর গৌরব সূর্য ডুবে গেল। ব্যবসাদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ উর্বর বঙ্গদেশে তার প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

বণিকের মাণদণ্ড—পোহালে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। ব্যবসাদাররা টাকাই বোঝে, দেশের মানুষকে তারা শোষণ করতে ছাড়ত না। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যখন নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা

দিল তখন ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। অত্যাচারের হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচান হবে এটা ঘোষণা করা হ'ল। ইংরাজের এই চতুরতা বুঝতে পারলেন না বাংলা-বিহারের কৃষকেরা। ইংরাজ এক চালে শান্ত করলো ভারতবাসীকে—মাণদণ্ডকে পরিণত করলো রাজদণ্ড রূপে।

ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যে জয়লাভ করে ইংরাজ পর্য্যায়ক্রমে মীরজাফর, মীরমদন এবং মীরকাশেমকে নবাব করেন। সেই সময় রাজ্যের ক্ষমতা হাতে নেবার সাহস ক্লাইভ বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কারও হয়নি। ক্লাইভ লিখে গেছেন যে, মুর্শিদাবাদে যখন তাঁর বিজয়ী সেনারা প্রবেশ করে তখন রাস্তার দু'পাশে যে অগণিত দর্শক সমবেত হয়েছিল তারা শুধু লাঠি, মুগুর, ডাণ্ডা নিয়ে আক্রমণ করে সেই সৈন্য-দের পিষে মেরে ফেলতে পারতো। নিরীহ সন্ত্রস্ত বাঙালী সেদিন নিরব ছিল। কিন্তু ক্লাইভের ভয় যায়নি, তাই হঠাৎ শাসন ভার দখল করতে তিনি চান-নি। তা সত্ত্বেও নবাব'রা নামেই নবাব ছিলেন, বাংলা ও বিহারের প্রকৃত নবাব ছিলেন ক্লাইভ।

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর নূতন নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নগদ পুরস্কার পেল প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ২৪ পরগণার জমিদারী। প্রথম কয়েক মাস ধীরে চ'লে ব্যবসায়ী কোম্পানী নিজের আয় বাড়াবার দিকে নজর দিল। কোম্পানী স্থির করলো যে, ২৪ পরগণার প্রতিটি পরগণা নীলামে দেওয়া হবে। নীলাম যিনি সবচেয়ে বেশী টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেবেন তাঁকেই সেই পরগণার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। যিনি খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পাবেন তিনি নিজের ইচ্ছামত খাজনা আদায়

করে কোম্পানীকে দেয় নীলাম ডেকে নেওয়া প্রতিশ্রুত টাকা দিয়ে বাকীটা নিজের পকেটে রাখতে পারবেন। এই সব আদায়কারীরা কোম্পানীকে দেয় টাকা অপেক্ষা ঢের বেশী টাকা আদায় করতেন। কৃষকদের শোষণ করে তার সঙ্গে আদায় হতো জরিমানা, জবরদস্তি ঘুষ। কোম্পানীর কর্তারাও যথেষ্ট পরিমাণে ঘুষ আদায় ক'রে নিজেদের পকেট ভারি করতে থাকেন। এ সব কারণে কৃষকদের উপর এতো অত্যাচার হয়েছিল যে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টেরও টনক নড়ে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যাপারে তদন্তের জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোম্পানীর কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় ১০ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। ক্লাইভের শোষণ ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করতে হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল লর্ড মেকলেকেও। তিনি বলেছেন, কিছুকালের মধ্যে কলকাতায় প্রচুর ধন সম্পদ সঞ্চিত হলো, আর সেই সঙ্গে দুর্দশার শেষ স্তরে নেমে এলো সেখানকার তিন কোটি সাধারণ মানুষ।

যাঁরা নীলাম ডাকতেন অধিকাংশ সময়েই তাঁরা আসতেন বাইরে থেকে। কোম্পানীর কর্তারাও নিজেরাই অনেক সময় নীলাম ডেকে খাজনা আদায়কারী বনে যেতেন। কোম্পানীর বলে বলীয়ান হওয়ায় এঁদের জুলুম চরমে উঠতো।

মীরকাশেমের (১৭৬০-৬৩) সময় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। নবাবী শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের খাজনা আদায়কারী জমিদাররা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠতে থাকেন। এঁরা প্রথমে ছিলেন সরকারের খাজনা আদায়কারী। এই আদায়ের কিছু বিধিও ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্ব স্ব প্রধান হ'য়ে ওঠার পর এঁরা সমস্ত বিধি ভঙ্গ করে ইচ্ছামত আদায় করে নিজেদের পকেট ভারী করতে

থাকেন। নিজেদের স্বার্থে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে গিয়ে তাঁরা প্রজা সাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করেন। তা সত্বেও এঁরা ছিলেন স্থানীয় লোক ; তাই রাস্তাঘাট বানান, পুকুর কাটা প্রভৃতি কিছু কিছু জনহিতকর কাজ করতে তাঁরা বাধ্য হতেন—তাই প্রজা-সাধারণ অত্যাচারিত হয়েও অশান্ত হয়ে উঠতেন না। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হ'ল। নীলাম ডেকে নিত প্রধানতঃ বাইরের লোকেরাই, কোম্পানীর মাতব্বররাও। জনহিতকর কাজ এঁরা করতে এগোতেন না। তাই এই সময় থেকেই ক্ষোভ প্রকাশিত হতে লাগলো।

মীরকাশেম সরকারের দুর্বলতা উপলব্ধি করলেন। বহু অঞ্চলের জমিদাররা স্ব স্ব প্রধান হ'য়ে উঠছেন তাও দেখলেন। তাই রাজত্ব হাতে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি চুক্তি করে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। কোম্পানী সবক'টি জেলায়ই অত্যধিক রাজস্ব বাড়িয়ে দিল। তার পদস্থ কর্মচারী, মুৎসুদ্দি গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ঘুষ আদায়ের চেষ্টায় এবং অন্যবিধ অত্যাচারে আদায় দিতে না পেরে অনেক অঞ্চলের কৃষকরাই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। বহু জমি চাষের অভাবে পতিত হয়ে থাকে। পলাতক কৃষকদের মুখে অত্যাচারের কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে—একটা সন্ত্রাসের ভাব দেখা দেয় বিভিন্ন স্থানে। এ অবস্থায় করণীয় কি তা নিয়েও অল্পস্বল্প আলাপ-আলোচনাও আরম্ভ হয়।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী পায়। বাংলা এবং বিহারের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেল তারা। বিভিন্ন অঞ্চলে তখন জমিদাররা খাজনা আদায় ক'রে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা সরকারের কাছে জমা দিত।

সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা ইচ্ছামত খাজনা আদায় করতেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা সরকারের কাছে জমা দিয়ে বাকীটা তাঁরা আত্মসাৎ করতেন। কোম্পানী এতোটা জমিদারদের ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। কোম্পানীর তরফে জমিদারদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব বেশী খাজনা আদায়ের জন্ম বাংলায় নায়েব বা নাজিম নিযুক্ত হলেন মহম্মদ রেজা খাঁ এবং বিহারে নিযুক্ত হলেন সীতাব রায় এবং দেবীসিংহ।

প্রভুদের খুশী করার ওপর নিজের উন্নতি নির্ভর করছে বুঝে রেজা খাঁ খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। এ ধরণের স্বার্থপর মানুষ চিরকালই পৃথিবীতে পাওয়া যায়। একালেও এধরণের বহু রেজা খাঁ পাওয়া যাবে। চাপ দিয়ে অত্যধিক আদায়ে সক্ষম ব্যক্তিদের উপরই রেজা খাঁ দায়িত্ব দিতে থাকলেন।

খাজনা আদায়কারী এবং তাদের পিছনে থাকা রেজা খাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন কৃষকরা—ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। লোক দেখান চোখের জল ফেললেন বাংলার লাট সাহেব এবং নবাবের দরবারের ইংরাজ প্রতিনিধি। কৃষকদের উপর খাজনার পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়িয়ে তাঁদের ছিব্ড়ে করে দেবার জন্ম তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেও প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করলেন না।

কৃষকরা একসময় জেলা হিসাবে একত্রে খাজনা দিতেন। এ সময় থেকে সে ব্যবস্থা বদলে প্রত্যেক কৃষকের পৃথকভাবে খাজনা আদায় দেবার ব্যবস্থা হলো। কৃষকের উৎপাদিত খাদ্য-শস্যই এতদিন খাজনা দিতে হতো—এখন থেকে মুদ্রায় খাজনা দিতে হবে স্থির হলো। অত্যন্ত সুবিধে হয়ে গেল কৃষকদের শোষণ করার। কোম্পানীর দেশী বিদেশী ছোট বড় সমস্ত কর্মচারী কৃষকদের সমস্ত খাদ্যশস্য বিক্রী করতে বাধ্য করতেন—সমস্তই তাঁরা গুদামজাত করে রাখতেন। কৃষকদের খাবার

প্রয়োজন হলে নিজেদের চাষে উৎপন্ন চাল অনেক বেশী দামে কিনতে হতো। কম দামে বিক্রী করে অনেক বেশী দামে তাঁরা চাল কিনতে বাধ্য হতেন। বাধ্য হয়ে নিজেদের মৃত্যুবাণ তাঁরা নিজেরাই তৈরী করতেন।

এবার কৃষকদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে মাঠে নামলো মহাজনের দল। চাষের প্রয়োজনে মহাজনের দিকে হাত বাড়াতেই হলো কৃষকদের। সুদে-আসলে ঋণের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে কৃষকের বাড়ানো হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দিল মহাজনরা। কৃষক পিষ্ট হয়ে গেল দু'দিকের জাঁতা কলে। খাজনা আদায়কারী এবং মহাজনেরা মিলে ভূমি থেকে উৎখাত করলো বহু কৃষককে। অনাবাদী পড়ে রইলো বহু জমি—ক্রমে অনেক অঞ্চল জঙ্গলে পরিণত হলো।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে শোষণ এবং খরার ফলে দেখা দিল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। 'আনন্দমঠ'-এ এই দুর্ভিক্ষের কথা বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়েছেন। এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশে এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। চালের চোরাকারবার করে কোম্পানীর দেশী-বিদেশী কর্মচারীরা ধনী হয়ে উঠলেন—সর্বস্বান্ত হলেন এদেশের অধিকাংশ কৃষক, অনেক রাজা-জমিদারও। 'আনন্দমঠ'-এর মহেন্দ্র সিংহ সে ধরণের এক জমিদার। মহেন্দ্র সিংহকে বঙ্কিম নিজের কল্পনা থেকে সৃষ্টি করলেও অনেক মহেন্দ্র সিংহেরই এ দুরবস্থা হয়েছিল সে সময়।

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির এবং চালের চোরাকারবারের জন্য রেজা খাঁ অভিযোগ আনলেন কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। তারাও একই অভিযোগ আনলেন রেজা খাঁর বিরুদ্ধে। আসলে দু'পক্ষই ছিল দোষী—কৌশলে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষদের সব কিছু লুটে নিয়েছিলেন তাঁরা যাঁদের হাতে তখন ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা যাঁদের

হাতে তাঁরা যদি অসৎ-লোভী হন, তাহলে চিরকালই দুর্দশার সীমা থাকে না সাধারণ মানুষের।

আশ্চর্য এই যে প্রজাসাধারণের দুরবস্থা নিয়ে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ হলেও তাঁদের নানা বিষয়ে কিছু সুবিধা দেবার কথা কেউ মনেও আনলেন না। খাজনা আদায়ের জন্য জুলুম আরও বেড়ে গেল। অত্যাচার এবং জুলুম এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কুখ্যাত লর্ড-সাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচুর্যের দিনে যত খাজনা আদায় হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী আদায় করা হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীঃ সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের পরের বৎসর। অন্যায়, অত্যাচার এবং ঘুষের দায়ে এই ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট সদস্য বার্ক সাহেব কঠোর ভাষায় যে তীব্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা অমর হয়ে আছে। সেই দুর্নীতিপরায়ণ হেষ্টিংসও জুলুমের নিন্দা করেছিলেন; তা থেকেই কৃষকদের উপর কি অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল তা বোঝা যায়।

কোম্পানীর বুদ্ধিমান কর্মকর্তারা সমস্ত জুলুমের দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন রেজা খাঁর উপর—পদচ্যুত করলেন তাঁকে। তাঁরা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন প্রজা সাধারণকে যে তাঁরা থাকতে অত্যাচারীর রেহাই নেই—তাঁদের বাঁচাবার জন্যই তাঁরা রেজা খাঁকে সরিয়ে দিলেন; কিন্তু ইংরাজ বেশীদিন মুখোশ পরে থাকতে পারেন নি।

বহু সাধারণ প্রজা এমনকি বীরভূমের রাজাও খাজনা কমাবার জন্য আবেদন-নিবেদন জানালেন। কিন্তু ব্যবসায়ী কোম্পানী এসেছে পকেট ভারী করতে, তাঁরা সে সব শুনবেন কেন? আয় কমালে কি তাঁদের চলে?

বড়লাটের কর্মচারী কান্ত বাবু বিষ্ণুপুর এবং পানচেটের খাজনা আদায়কারী নিযুক্ত হলেন। পানচেটের খাজনা দ্বিগুণ ক'রে দেওয়া হলো। যারা ঘুরে ঘুরে খাজনা আদায় করতো তারা নানা অছিলায় নিজেদের স্বার্থে আরও বেশী আদায় করে নিত। কোন উপায় না দেখে বহু কৃষক ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়ন করতে থাকেন—অনেকে বনে-জঙ্গলেও আশ্রয় নিলেন। যাঁরা রয়ে গেলেন আদায়কারীরা তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন পলায়নকারীদের দেয় খাজনা। অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। যে পালায় সেই বাঁচে এই নীতিবাক্য স্মরণ করে দলে দলে কৃষক বেরিয়ে পড়লেন পথে—বহু আশ্রয় নিলেন বনে-জঙ্গলে। নির্দিষ্ট খাজনা আদায় করে দিতে না পারায় বহু আদায়কারীকে কারাগারে নিখোঁজ করলেন কোম্পানীর সাহেবরা। ভেতর থেকে যেন ভূতের মতো কাল মন দাঁত-নখ বের করে বাংলার চাষীদের রক্ত শোষণ করবার জন্য লোলুপ হয়ে উঠলো। বাঙ্গালী কৃষকদের তাঁরা বড়ই নির্জীব মনে করেছিলেন সেদিন। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতে দেরী হয়নি।

বর্ধমান জেলার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এক অদ্ভুত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সে জেলার উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল অতএব সেই দুই অঞ্চলে খাজনার কিছু ছাড় দেওয়া হবে কিন্তু যেহেতু দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলে অতটা মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হয়নি সেহেতু তাদের পুষিয়ে দিতে হবে এই মুকুব খাজানার পরিমাণ টুকু—অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট খাজানার পরিমাণ থাকবে সমান। একেই বোধ হয় বলে ন্যায় পরায়ণতা! ব্যবসায়ীদের লোভের লালসাকে জিহ্বা এমনি করেই প্রকাশ পায়। দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলে হলেই বা বহু মানুষের মৃত্যু, না হয় চাষ কমই হয়েছে, কিন্তু উত্তর এবং পূর্বের মতো

অত ভয়ঙ্কর অবস্থা যখন নয়, তখন খাজনা বাড়তে দোষ কি ? এ'তো শুধু মোট খাজনার পরিমাণটা সমান রাখার চেষ্টা মাত্র। চমৎকার সাহেবী যুক্তি ! মেদিনীপুরের হিজলী, মহিষাদল, তমলুকের দুর্ভিক্ষ অন্যান্য অঞ্চলের মতো মারাত্মক না হওয়ায় খাজনা বাড়ানো হলো। সমস্ত হুগলীতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছিল মারাত্মক ভাবে। সমস্ত অঞ্চলেই যখন বিপদ সমান তখন সমস্ত অঞ্চলেই খাজনা বৃদ্ধি করতে আর বাধা কি ? সমস্ত হুগলীর খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হলো—

কি রঙ্গ জানে সাহেব কোম্পানী,
কলেতে ধোঁয়া ওঠে ঢাকে ধরণী।

ধোঁয়ায় সমস্ত বাংলাকে আচ্ছন্ন করে দেবার চেষ্টা করলেন সাহেব কোম্পানী। দিনাজপুর, রঙ্গপুরের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠলো। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষদের নিশ্বাস রোধ হবার উপক্রম হলো। দিনাজপুরের রাজাও তাঁর সর্বস্ব হারালেন। দলে দলে মানুষ পালাতে লাগলেন। বাংলার সমস্ত জেলার অবস্থাই হয়ে উঠলো শোচনীয়। যশোহর জেলায় চাষ আবাদ প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। রাজশাহী জনশূন্য বলে মনে হ'তে লাগলো।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আর তো পিছু হটার উপায় থাকে না। ২৪ পরগণা কোম্পানীর হাতে এসেছিল সর্বপ্রথম। ব্যবসায়ীদের লোভের পরিচয় সবচেয়ে আগে পেয়েছেন সেখানকার কৃষকরা। তাই তাঁরা অবস্থা বুঝে নিজেদের একটা সংগঠন তৈরী করে নিয়েছিলেন। তাঁদের খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হতেই তারা সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানালেন। বিপন্ন বোধ করলেন খাজনা আদায়কারীরা।

দেবী সিংহের অত্যাচার জর্জরিত পূর্ণিয়ার চাষীরাও সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। ক্রমে তাঁদের ঐক্য দৃঢ় লৌহ দণ্ডের ন্যায় হয়ে ওঠে।

একসঙ্গে তারা দাবী তোলেন, আন্দোলন করেন। নিজেদের সুবিধামত না হ'লে তাঁরা চাষের কাজেই হাত দেন না। যদি খাজানার পরিমাণ খুব বেড়ে যায় তবে চাষ করলেও তো নিজেদের খাবার থাকবেনা— চাষের সমস্ত উৎপাদনই নিয়ে যাবে খাজনা আদায়কারীরা। তাহলে চাষ না করলেই তো লাভ? খাজনা আদায়কারীরা শূন্য হাতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। চাষের কষ্ট স্বীকার করে অথবা কোম্পানীর ঘর ভর্তি করে লাভ কি! পূর্ণিয়ার বুদ্ধিমান লড়াকু কৃষকদের সামনে এসে পিছু হটতে হয় খাজনা আদায়কারীদের। দিনাজপুরেও প্রতিরোধ আরম্ভ হ'লো।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২০ বছর ধরে বাংলায় কৃষকদের একটানা দুর্ভোগ ভুগতে হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী নূতন কিছু করার কথা ভাবলেও পূর্বের ব্যবস্থায় ফিরে যায়। আবার কৃষকদের উপর পূর্বের থেকেও বেশী অত্যাচার আরম্ভ হয়। দিনাজপুর রঙ্গপুরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। অত্যাচার নিপীড়ন কঠিনতম অবস্থায় পৌঁছলেই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে'। তখনই তো মনে হবে—

কারার ওই লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল, ক'ররে লোপাট।

বাংলার কৃষকরা সেই কঠিনতম দিনে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়লেন। তৈরী করলেন অক্রমণের পর আক্রমণ। বল্লম, তীর-ধনুক পাল্লা দিতে প্রস্তুত হলো বন্দুকের সঙ্গে।

দেবীসিংহ পূর্ণিয়ার ইজারাদার হয় এবং পরে কার্যত হ'য়ে ওঠে তার শাসনকর্তা। তার অত্যাচারে-উৎপীড়নে পূর্ণিয়া শ্মশানে পরিণত

হয়েছিল। প্রজাদের হাহাকারে কোম্পানীর টনক নড়ে—দেবীসিংহ পদচ্যুত হয়।

অত্যধিক অত্যাচারে একটা সুফলও দেখা যায়। অত্যাচারিত কৃষকরা পলায়ন করলেও ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হন। ক্রমে পূর্ণিয়ায় কৃষকরা এমন ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ওঠেন যে, তাঁদের সম্মতি না নিয়ে পরবর্তীকালে ইজারাদাররা খাজনা স্থির করতেও সাহস পেত না।

দেবীসিংহ পদচ্যুত হ'লেও ঘুষ দিয়ে বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বশীভূত করে রঙ্গপুর-দিনাজপুরে ইজারদার হ'য়ে বসে। তার নির্মম অত্যাচারে সেখানকার কৃষকরাও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেন। কৃষক বিদ্রোহ কঠিন আকার ধারণ করে এই অঞ্চলেই।

দেবীসিংহের অকথ্য অত্যাচারে জমিদার, কৃষক উভয়েই জমিহারা হলেন। এ কারণে বহু অঞ্চলেই জমিদার-কৃষকে মিতালি করেও পওনাদার বা ইজারাদারদের খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধতা করেছেন। তখন জমিদারদেরও একটা নির্দিষ্ট খাজনা আদায় করে ইজারাদারদের হাতে তুলে দিতে হতো। চাষীদের ওপর অত্যধিক অত্যাচার করে যাঁরা সে খাজনা আদায় করতে পারতেন না তাঁরা জমি হারাতেন, এসব ক্ষেত্রেই মিতালি হ'তো জমিদার-কৃষকে।

খাজনার দায়ে কিছু কিছু জমিদার এবং দলে দলে চাষীদের ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারীর গুদামে আটকে রাখা হয়েছে, দিনের পর দিন। প্রায় কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি তাদের। বেত মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া হয়েছে তাদের দেহ। পরিবার পরিজনদের ধরে নিয়ে বেগার খাটান হতো নির্বিচারে।

কোন উপায় নেই দেখে কৃষকরা প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। মারধোর, জমি কেড়ে নেওয়া মানে খাবার

উপায় কেড়ে নেওয়া। পরিবার পরিজনদের ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটান। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল কৃষকদের, আর তো পেছবার পথ নেই ; তাই মরিয়া হয়ে সামনেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কৃষকরা মিলিত হয়ে রঙ্গপুরের কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাড-এর কাছে এক স্মারক-লিপি পাঠালেন। জানালেন কয়েকটি দাবীর কথা—কালেক্টরের উত্তরের জন্য একটা সময় সীমাও বেঁধে দিলেন তাঁরা। কিন্তু ব্যবসাদার ইংরাজ কোম্পানী নিযুক্ত ইংরাজ কালেক্টর পেট মোটা করা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায়না, তাই কোন জবাব পেলেন না কৃষকরা। কৃষকরা কতদূর যেতে পারেন তা ভাবতেই পারেননি ইংরাজ কালেক্টর। মরিয়া হয়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ কৃষকের দল খাজনা বন্ধ ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এই ঘোষণা করেন তাঁরা। কলকাতার কর্তৃপক্ষের কাছে গুডল্যাড খাজনা বন্ধের সংবাদ পাঠিয়ে দেন। ইজারাদার দেবীসিংহের বিরুদ্ধেই হয়েছেন তাঁরা সংঘবদ্ধ। জবরদস্তি খাজনা আদায় করা উচিত বলেই তিনি মন্তব্যও করেন।

দেবীসিংহের অত্যাচার কি রকম—প্রজাদের অবস্থা কি, তাঁদের বাঁচার কোন পথ আছে কিনা এসব অনুসন্ধান ক'রে দেখার প্রয়োজনও মনে করলেন না ব্যবসাদাররা। হাঁসের পেটের সোনার ডিমটার দিকেই ছিল তাঁদের নজর—হাঁসটাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারেই ছিল তাদের তাচ্ছিল্য।

নিরুপায় কৃষকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী (৭ই মাঘ ১১৮৯ সাল) রঙ্গপুরে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। অত্যাচার দূর করার আবেদন তুচ্ছ করল ইংরাজ। কৃষকরা নিজেরা যখন অত্যাচার দূর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হ'লেন তখন দাম্ভিক ইংরাজের প্রতিনিধি গুডল্যাড চোখ পাকিয়ে ধমক দিলেন। ২৬শে

জানুয়ারী আট দিনের দিন, গুডল্যাড কৃষকের অস্ত্রত্যাগের আদেশ দিলেন। নভেম্বরে পাওয়া কৃষকদের স্মারকলিপি পেয়েও যিনি দু মাস চুপ করে রইলেন তিনিই কৃষকদের হাতে লাঠি, বল্লম, তীর, ধনুক দেখে আট দিনও আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। সুসভ্য শাসক বটে!

কিন্তু জল তখন অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। দরিদ্র হ'লেও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল কৃষকদের। তা ছাড়া উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচার অন্য কোন উপায় তো ছিল না। কৃষকরা অস্ত্র ত্যাগ তো করলেনই না, বরং বিদ্রোহের প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে লাগলেন।

টেপাতেই বিদ্রোহীরা প্রথম সমবেত হতে লাগলেন। সেখানে বাংলা বিহারে এবং ভারতের অন্যত্রও ইংরাজ শাসনকর্তা হলেও দিল্লীতে মুসলমান সম্রাট এবং বঙ্গ-বিহারে নবাবরা তখনও ছিলেন। রাজ্যের আইনগত প্রধান তখনও নবাব। বিদ্রোহীরা তাঁদের 'নবাব' মনোনীত করলেন ধীরাজ নারায়ণ রায় ব'লে একজন তেজী কৃষককে। ধীরাজনারায়ণের দেওয়ান হলেন কেনা নামে আর এক বিদ্রোহী কৃষক। সংগ্রাম চালাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। বিদ্রোহীরা সে জন্য সাধ্যমত চাঁদা দিলেন। সেই চাঁদাই হলো 'নবাব' এবং 'দেওয়ানকে' দেয় নজরানা। প্রজারা নবাব বা জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে এলে 'নজরানা' দিতেন, সেটাই ছিল নিয়ম। এখানে এই 'নজরানা' ধীরাজ বা কেনার নিজের সম্পত্তি হলো না—হ'লো বিদ্রোহের জন্য বল্লম প্রভৃতি বানাবার রসদ। অন্য অঞ্চলে 'নবাব' মনোনীত হলেন নুরুলউদ্দীন—দয়াশীল হলেন তাঁর দেওয়ান।

ইংরাজ কোম্পানীর ইজারাদার দেবী সিংহকে আর খাজনা দেওয়া হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন বিদ্রোহীরা। দেবীসিংহের খাজনা আদায়কারী অনেক কর্মচারীকে হত্যা করা হ'লো; অনেককে তাড়িয়ে

দেওয়া হলো। কেউ কেউ আগেই বুঝতে পেরে পলায়ন করলো। টেপার জমিদারের নায়েব একদল বরকন্দাজ নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দিতে এলেন। বিদ্রোহীরা বরকন্দাজের কিছুমাত্র গ্রাহ্য করতেন না, সুতরাং সামান্য লড়াই হতেই আহত বরকন্দাজদের ফেলে অন্যেরা পালিয়ে গেল ; নিহত হলেন নায়েব নিজে।

সমস্ত জেলায় এবং সব জেলার বিভিন্ন পরগণায় বিদ্রোহ না ছড়াতে পারলে জয় হবে না এটা বিদ্রোহের নেতারা বুঝেছিলেন। তাই কিছু বিদ্রোহী এলেন কাকিনা পরগণায়। খাজনা না দিতে পারার জন্য যাদের কাছারিতে আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের এবার মুক্ত করলেন এবং কাছারির খাজনা আদায়কারী কর্মচারীদের ধরে নিয়ে এলেন কাজিরহাট পরগণার বালাগঞ্জে। বিদ্রোহীদের শক্তিশালী বড় ঘাঁটি হয়েছিল এখানেই। বহুসংখ্যক বিদ্রোহী এখানে জমায়েত হয়েছিলেন।

প্রধানত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ ঘটলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছিল অনেক। খাজনা আদায়কারী কর্মচারী দেখলেই তাকে হত্যা করা হতো। কখনও কখনও ধরে আনাও হ'তো। যেখানে সেখানে কর্মচারী আক্রমণও করেছেন বিচ্ছিন্ন দলবদ্ধ বিদ্রোহীরা। অত্যাচারী খাজনা আদায়কারীদের মনে ভয় জাগিয়ে তোলারও প্রয়োজন ছিল। একদল বিদ্রোহী কাজিরহাট পরগণার কিশোরগঞ্জের কাছারি আক্রমণ করে বসলেন। কুখ্যাত অত্যাচারী খাজনা আদায়কারীদের নেতা সেখ মহম্মদ মোল্লার আস্তানা ছিল এখানে। স্বভাবতঃ কিছু বিদ্রোহীর নজর পড়েছিল এদিকে। খাজনা ইচ্ছামত বাড়িয়ে কৃষকদের জোর ক'রে কাগজে সই করিয়ে নিত লোকটা। নূতন নূতন অত্যাচারের ফন্দিও বের হতো তার মাথা থেকে। তাই একে শাস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সমবেত ভাবে বিদ্রোহ

ঘোষনার আগের দিন অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারী ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মোল্লা জানতে পারল যে, কয়েক শত কৃষক লাঠি বল্লম প্রভৃতি নিয়ে তার কাছারির কাছাকাছি একত্রিত হয়েছেন। চতুর লোকটি রামকান্ত ও শ্যাম চৌধুরী নামে দুই জমিদারের ওপর কাছারি দেখাশোনার ভার দিয়ে পালিয়ে গেল। যাবার আগে অবশ্যই সকলকে ভরসা দিয়ে গেল যে, রঙ্গপুর থেকে সিপাহী নিয়ে আসবে। সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাদের বাধে না তারা সত্যিই শয়তান।

পরের দিন অর্থাৎ কৃষক বিদ্রোহ আরম্ভের দিন বিদ্রোহীরা কাছারি আক্রমণ করলেন। সেখ মহম্মদকে না পেয়ে হতাশ হয়ে তারা কাছারিতে আগুন লাগিয়ে তা ধ্বংস করে ফেললেন। রাম এবং শ্যাম বিদ্রোহীদের সমর্থন জানিয়ে মুক্তি পান এবং পরে সপরিবারে পলায়ন করেন।

বিদ্রোহীদের আর একটা দল কাজির হাটের কালকাপুরে এসে আক্রমণ করেন গোবিন্দরাম মজুমদারের কাছারিবাড়ী। গোবিন্দরাম ছিলেন দেবীসিংহের বিশেষ প্রিয় পাত্র গৌরমোহন চৌধুরীর গোমস্তা। নিষ্ঠুর অত্যাচারী গোবিন্দরামকে প্রচণ্ড প্রহার দেওয়ার পর মৃত মনে ক'রে ফেলে রেখে যান বিদ্রোহীরা। তাঁরা এবার দলবদ্ধভাবে প্রচণ্ড সোরগোল তুলে রওনা দেন ডিমলার দিকে। ডিমলার বিদ্রোহী কৃষকদেরই উৎসব সবচেয়ে বেশী। দেবীসিংহের সহচর জমিদার গৌরমোহন চৌধুরীকে এবার দেখে নেবেন তাঁরা আগে আগে চললেন তাঁরা। বিদ্রোহীদের সঙ্গে চলেছেন তাঁদের নেতারাও।

গৌরমোহনের বরকন্দাজের সংখ্যা ছিল অনেক, তাই মনে ভরসা ছিল যথেষ্ট। তিনি আগ বাড়িয়ে আক্রমণ আরম্ভ করলেন। ধরলেন কয়েকজন সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহীদের সহযোগী সন্দেহে। ওদিকে

পৌঁছে গেছেন বিদ্রোহীরা, বরকন্দাজরা গুলি চালাবার আদেশ পেয়েছে।

অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান উদ্দেশ্য। গৌরমোহনের বরকন্দাজ-ঘোরসওয়ারদের তাঁরা সে কথা জানালেন। বরকন্দাজরা তাঁদের আশ্বাস দিল। অস্ত্র ফেলে তাদের সঙ্গে আসতে বললো। অনেকে অস্ত্র ফেলে এগিয়ে যেতেই বরকন্দাজদের বন্দুক গর্জন করে উঠল। ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীরা তখন লাঠি বল্লম নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বন্দুকধারীদের ওপর। হাজার হাজার মানুষের চাপে পলায়ন করলো বরকন্দাজ-ঘোড় সাওয়ারের দল।

ডিমলার কাছারি লুণ্ঠিত হলো, প্রহৃত হলো কর্মচারীরা। মাথা কেটে ফেলা হ'লো গৌরমোহনের। কোম্পানীর চালের গুদাম ভেঙ্গে সমস্ত চাল বিলি করে দেওয়া হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে। খান চৌধুরী এ, আহমেদ তার কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "ইহার পর কাকিনা, ফতেপুর, কাজিরহাট এবং টেপা পরগণার বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হইয়া কর সংগ্রাহক নায়েব এবং গোমস্তা প্রভৃতিকে যত্রতত্র বধ করিতে আরম্ভ করে। ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী বিদ্রোহীদিগের বাধা দিতে অগ্রসর হলে তাহারও জীবনান্ত ঘটে।"

অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠায় রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেব মীমাংসার চেষ্টা চালাতে এগিয়ে এলেন। বিদ্রোহ জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা হ'লেও তখনও তা ব্যাপক হ'য়ে ওঠেনি। চতুর ইংরাজ বুঝে নিলেন যে, দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা ইংরাজের বিরুদ্ধতায় দাঁড়াতে পারে। কোন কোন অঞ্চলে তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছিল। গুডল্যাড তার প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠালেন মাণিক চাঁদ এবং নাজির গোমানীকে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কৃষকরাই একত্র

হয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন তাই আলোচনার জন্যও তিনি একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমানকে নিজের প্রতিনিধি মনোনীত করেন। বিদ্রোহীরা তিনটি দাবী জানালেন—গুডল্যাড মুদ্রা সংক্রান্ত দাবিটি মেনে নিলেন, মেনে নিলেন এক বিশেষ ধরণের খাজনা আদায় না করার দাবীও, কিন্তু দু'মাসের জন্য খাজনা আদায় বন্ধ রাখতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বিদ্রোহের নেতারা গুডল্যাডের বক্তব্য নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন এবং অসন্তোষ মনে রেখেই দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য গুডল্যাডের প্রস্তাব মেনে নিয়ে অস্ত্রত্যাগ করে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন।

এদেশের ইংরাজ কর্মচারীরা বার বার মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। গুডল্যাডের চরিত্রেও কোন সততা ছিলনা। তিনি মনে করলেন সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহীরা যখন একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তখন আবার তাদের একত্র করে দানা বাঁধিয়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই তিনি চুক্তির যে শর্তই মেনে নিয়ে থাকুন না কেন, কাজের বেলায় সেই ঘৃণিত, অত্যাচারী খাজনা আদায়কারীদের আবার কাজে বহাল করলেন। কাজিকহাটে পাঠানো হলো সেই দুর্বৃত্ত সেখ মহম্মদ মোল্লাকে। কাকিনায় এলেন রামদুলাল ভট্টাচার্য আর শয়তান গোকুল মেহেতা গেলেন টেপায়। আগের থেকেও বেশী জবরদস্তি শুরু হলো—সমস্ত ন্যায়-নীতি পায়ের তলায় ফেলে খাজনা আদায় আরম্ভ হলো। ইংরাজের ধান্দাবাজী বুঝতে পারলেন মার খাওয়া কৃষকেরা। প্রাণ এবং মান বাঁচাবার জন্য আবার তারা মার দেবার জন্য বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন।

বরকন্দাজ ঘোড়সওয়ারদের সাহায্যে কাকিনায় রামদুলালের অত্যাচার চরমে উঠল। জবরদস্তি খাজনা আদায় এবং ইচ্ছামত

অসম্মান করা নয়, কৃষকদের পরিবার পরিজনদের ধরে নিয়ে এসে বেগার খাটানও চলতে লাগল। তাঁর আদেশে কত যে ঘর-দোর পুড়িয়ে ছাই করে দিল তাঁর লোকেরা তার হিসেব করা সম্ভব নয়।

রামত্নলালের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকেরা লাঠি-বল্লম হাতে হাজারে হাজারে পদযাত্রা শুরু করলেন তাঁর বিরুদ্ধে। খাজনা আদায়কারীরাও সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহীরা বরকন্দাজদের যে গ্রাহ্যও করেন না তা তারা বুঝে গিয়েছিল,—তাই তাঁরা সব সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদের মজুত রাখতো কাছারিতে। রামত্নলাল তাদের সাহায্য নিলেন বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিতে। বন্দুকের সঙ্গে লাঠি-বল্লমের অসম যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব! কিছু কিছু সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী কৃষকদের পিছু হটতে হলো। কিন্তু তা সত্বেও যে সব বিদ্রোহীকে বন্দী করে কড়া পাহারায় রঙ্গপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাঁদের পথ থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে এলেন বিদ্রোহীরা। ফারমানবাড়ীর কাছারিতে রামত্নলাল আছেন এই সংবাদ পেয়ে বন্দুকের লড়াইয়ের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার বিদ্রোহী আচমকা সেই কাছারি আক্রমণ করলেন। কিন্তু ঠিক আগেরবারের মতই অন্যায়ের প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন তিনি। প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিদ্রোহীরা অনেকটা শান্ত হন বলে বিদ্রোহ আর অধিক দূর ছড়াতে পারেনি।

ওদিকে একজন জমাদারের অধীনে বরকন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার নিয়ে টেপায় এলেন শয়তান গোকুল মেহেতা। পলাতক শয়তান আবার ফিরে এসেছে—নিশ্চয়ই আরও কুমতলব নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই গুজব রটে গেল যে, গোকুল খাজনা আদায়ের নামে কৃষকদের ঘর-দোর জ্বালাতে আসছেন। আত্মরক্ষায় দ্রুত সংঘবদ্ধ হলেন কৃষকেরা—দলনেতা মনোনীত হলেন রামপ্রসাদ সরকার। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ছিল হাটের দিন, সাধারণ

গ্রামবাসীদের সঙ্গে এখানে দলে দলে এসে মিলিত হলেন বিদ্রোহী কৃষকেরা। সুবিধা মত স্থানে ঘোড়সওয়ার-বরকন্দাজদের নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন মেহেতা। কৃষকদের সুযোগ সুবিধা দেবেন, ন্যায় বিচার করবেন বলে তিনি বিক্ষুব্ধ কৃষকদের লোভ দেখাতে লাগলেন—নিশ্চিন্ত মনে তাঁর কাছেও আসতে বললেন। আগেও একবার এরকম হয়েছে, তাই বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা সতর্ক ছিলেন। কেউ কেউ মেহেতাকে দেখিয়ে অস্ত্র-ত্যাগ করলেও অনেকেই অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে চললেন। যা আশঙ্কা করেছিলেন বিদ্রোহীরা তাই ঘটলো। গুলি-তীর চালিয়ে আক্রমণ করল বরকন্দাজ ঘোড়সওয়ারেরা। বিদ্রোহীরা অপ্রস্তুত ছিলেন না - নিজেদের হতাহতের দিকে না তাকিয়ে তাঁরাও আক্রমণ করলেন। বরকন্দাজ ঘোড়সওয়ারদের, ঘিরে ফেললেন শয়তান গোকুল মেহেতাকে। কয়েকজন বরকন্দাজ সহ নিহত হলো জমাদার। ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীরা হত্যা করলেন গোকুল মেহেতাকে।

বিদ্রোহীদের আহ্বানে কোচবিহার ও দিনাজপুরের বহু অঞ্চলের কৃষকরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল সমস্ত অঞ্চল থেকে খাজনা আদায়কারীদের তাড়িয়ে দেওয়া, প্রহার করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা করা। অত্যাচারীর নিষ্ঠুরতার ওপরই সেটা নির্ভর করতো।

দিনাজপুরের উৎপীড়িত কৃষকরাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বোড়ার কাছারি আক্রমণ করে খাজনা আদায়কারী সমস্ত কর্মচারীকে ধরে নিয়ে যান। মূরপুরের কাছারি আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হয়—সেখানকার কর্মচারীরাও বন্দী হয়। খাজনা দিতে না পারায় যেখানে যত কৃষককে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেককেই মুক্ত করেন বিদ্রোহীরা।

দেবীসিংহের আর একজন বিশ্বস্ত অনুচর কৃপারাম বোস থাকতেন ধাঁতে। জালিয়াতি-জুয়াচুরীতে তিনি সুপটু ছিলেন। খাজনা এবং মিথ্যা পাওনার দায়ে তিনি বহু কৃষককে আটকে রাখতেন। ফলে এই কাছারিও হলো বিদ্রোহীদের আক্রমণের একটা বিশেষ লক্ষ্যস্থল। বিদ্রোহীদের আগমনের সোরগোল শুনে বন্দী কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে নিজেদের বাঁধন খুলে হাতে লাঠি-বর্শা যা পেলেন তাই তুলে নিলেন। ২০শে জানুয়ারী হাজারকয়েক কৃষক কাছারি আক্রমণ করে কৃপারাম সহ সমস্ত কর্মচারীকে বেদম প্রহার করেন। লুণ্ঠন করেন সঞ্চিত ধনরত্ন দলিল প্রভৃতি। প্রহৃত কৃপারামদের এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে যান বিদ্রোহীরা।

চারিদিকে বিদ্রোহের তাণ্ডব দেখে এবং নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের প্রহৃত এবং নিহত হবার সংবাদ পেয়ে দেবীসিংহ বুঝলো যে, বিদ্রোহ এভাবে চলতে থাকলে তাঁর পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাই সে একেবারে গুডল্যাডের কাছে হাজির হয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য আবেদন করলেন। গুডল্যাডও আর অপেক্ষা করতে চাইছিলেন না। বিদ্রোহ আরও ছড়িয়ে পড়লে তা দমন করা কঠিন হবে, তা তিনি বুঝলেন। ভরসা এই যে, দুচারটে দেশী বন্দুক ছাড়া বিদ্রোহীদের অস্ত্র-শস্ত্র বিশেষ নেই ঃ দু'এক শ' তীরন্দাজ অবশ্যই দলে এসে যেতে পারে আর কিছু বাঁটুল নিক্ষেপকারী !

কালেক্টর গুডল্যাডের নির্দেশে ইজারাদাররা বিদ্রোহীদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য পরোয়ানা জারি করলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পরগণার খাজনা আদায়কারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং গোমস্তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে, খাজনা দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের ঘরদোর যেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়— তাঁদের হাত-পা বেঁধে পরিবার পরিজন সহ যেন টেনে আনা হয় কাছারি

গুলোতে। গুডল্যাড নিজেও বিদ্রোহীদের হত্যার আদেশ দিলেন। দু'চারজনের ওপর চরম অত্যাচার করে সকলের মনে ভীতি সঞ্চার করার আদেশ দিলেন তিনি ঃ ঘর-দোর জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশও তিনি সমর্থন করলেন। সিপাহী বরকন্দাজের জোরে গুডল্যাডের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো—নেতাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো প্রকাশ্যে—সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য।

কিন্তু রঙ্গপুরের বিদ্রোহ দমন কঠিন হয়ে উঠলো। সমস্ত ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হলো। ভীত গুডল্যাডের মতে এমন বিপদের মধ্যে কোন কালেক্টরকেই এর আগে পড়তে হয়নি। ঘোরালো অবস্থা দমন করার জন্য লেঃ ম্যাকডোনাল্ডকে আহ্বান করলেন গুডল্যাড সাহেব। অত্যাচারের উদাহরণ সৃষ্টি করার নির্দেশও দেওয়া হলো তাঁকে। যে-কোন লোককে ধরে প্রকাশ্যে ফাঁসী দিয়ে ত্রাসের সঞ্চার করবার নির্দেশ পেলেন তিনি।

হাজার হাজার বিদ্রোহী বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন—একদল হাজির হলেন দিনাজপুরে, অপরদল গেলেন কোচবিহারে—অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। নূতন করে বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সর্বত্র—প্রতিনিয়ত ভারী হয়ে উঠতে লাগলো বিদ্রোহী দল।

গুডল্যাডের আদেশে লেঃ ম্যাকডোনাল্ড একদল সিপাহী নিয়ে উত্তর দিকে এবং আর একদল সিপাহী নিয়ে একজন সুবেদার দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। সিপাহীরা কোন রকম বিচার বিবেচনা না করে গুলি চালিয়ে হত্যার তাণ্ডব শুরু করে এবং গৃহে গৃহে আগুন লাগাতে থাকে। বহু অঞ্চলে বহুবার বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের খণ্ড যুদ্ধ হয়।

একজন ভিখারীকে ধরে প্রকাশ্যে ফাঁসী দিলেন ম্যাকডোনাল্ড – হাটে গুলি করে মারলেন কয়েকজনকে। ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হলো, বিদ্রোহ দমনের নামে। নিরীহ মানুষদের হত্যা করা হতে লাগল দলে দলে।

দেবী সিংহের প্রধান ঘাঁটি মোগলহাট বন্দরটিকে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড-ভাবে আক্রমণ করলেন। সেখানে বন্দুক-বল্লমের অসম যুদ্ধ হলেও তা ঘোরতর আকার ধারণ করে। অনেক নেতাসহ বহু বিদ্রোহী মৃত্যু বরণ করেন। এই সব মানুষগুলো মহৎ মৃত্যু বরণ করলেন।

বিদ্রোহীদের প্রধান অংশ তখন পাটগ্রামে। ম্যাকডোনাল্ড তাঁদের আক্রমণে অগ্রসর হলেন ; পথে তিনি তাঁদের শক্তির সংবাদ পেলেন। বন্দুকধারী ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষেরও বুক কেঁপে উঠলো। লাঠি-বল্লম-তীর-ধনুক ধারী মানুষগুলোকে আক্রমণ করতেও ইংরাজকে কৌশল অবলম্বন করতে হলো। সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে সিপাহীরা ছদ্মবেশ ধারণ করে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে এসে বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে। খুব ভোরে বন্দুকের আক্রমণ শুরু হয়। বিদ্রোহীরা রণদক্ষ ছিলেন না, তাঁদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য কোন চরও ছিল না। আচম্কা আক্রমণে তাঁরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু তা সত্বেও মরণপণ যুদ্ধ করতে তাঁরা পিছপা হলেন না। বহু বিদ্রোহী বীরের মৃত্যু বরণ করেন—বহু আহত বন্দী হল। ১৭৮৩ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ বিধ্বস্ত করে ইংরাজ তাণ্ডব শুরু করেন।

লাঠি-বল্লম ধারীরা এক স্থানে সিপাহীদের ঘিরে ধরেছিলেন। গুডল্যাডকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, সময়মত আরও বন্দুকধারী সিপাহী যদি তিনি না পাঠাতে পারতেন তবে বিদ্রোহীদের হাতে তাঁর অনেক সিপাহী প্রাণ হারাত। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়

লাঠি, তোমার সেদিন গিয়াছে'—সত্যিই তাই, যে লাঠি একদিন বন্দুকের সঙ্গে পাল্লা দিত আজ তা নিতান্তই বংশখণ্ড মাত্র !

আশ্চর্য এই যে, অত্যাচারী, নির্মম, স্বার্থসম্পন্ন সংকীর্ণচেতা দেবী সিংহ 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। ইংরাজ পদস্থ কর্মচারীদের নিকৃষ্ট মনের পরিচয় এতেই পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের পর বড়লাট হয়ে এলেন কর্ণওয়ালিস ঃ জমিদারদের সঙ্গে দশ-শালা চুক্তি ক'রে তিনি আবার প্রজাদের বিশেষ শোষণের সামগ্রী করে তোলেন।

রঙ্গপুর-দিনাজপুরে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলেও দেশের অন্যান্য জেলাতে নানা প্রকারের বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। তখন যশোর-খুলনা একটা জেলা। দুর্ভিক্ষের পরে জমিদার—মহাজনের অত্যাচারে অনেক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়েন। এঁরা বহুদিন ধরে লুটপাট করেন জমিদারদের কাছারি—মহাজন এমনকি কোম্পানীর খাজনাও।

বীরভূমে প্রায় হাজার কৃষক সর্বদাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকতেন। তাঁদের ভয়ে সিপাহীর সাহায্য ছাড়া কোন খাজনা আদায়কারী খাজনা আদায়ে বের হতে পারতেন না—বিদ্রোহী কৃষকরা খাজনা আদায় করতে দিতেন না। সিপাহীর সাহায্যে খাজনা আদায় করে কোম্পানীর ঘরে পাঠান সম্ভব হতো না, পথে তা নিশ্চিতরূপে লুণ্ঠিত হতো।

বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় রঙ্গপুরের বিদ্রোহ দমনের কয়েক বছর পরে, ১৭৯২ খ্রীঃ। এখানে নেতৃত্ব দেন বোলাকি শাহ নামে এক ব্যক্তি। ইনি বিদ্রোহী কৃষকদের নিয়ে কারিগরদের সাহায্যে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। বন্দুক ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। মোগলদের পরিত্যক্ত কয়েকটা কামান সংগ্রহ করে তিনি সেগুলো সারিয়ে নেন এবং গোলা নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন। এই

ফকির নেতার চেষ্টা দেখে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের কথা মনে জাগে। সত্যানন্দের নির্দেশে মহেন্দ্র সিংহের বাড়ীতে অস্ত্রাগার নির্মিত হয়েছিল। কামান প্রভৃতিও সেখানে তৈরী করা হতো।

ফরিদপুরের নড়াইলের জমিদারের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষকরা ইজারাদার এবং কোম্পানীর শক্তির মোকাবিলা করেছেন। ইজারাদার এবং কোম্পানীকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে অন্ততঃ বঙ্গদেশে কৃষক বিদ্রোহ সর্বাত্মক হতে পারতো এবং তা হতে পারলে সম্ভবতঃ ইংরাজের শাসন অনেক আগেই শেষ হতো এদেশে।

সে যাই হোক, এদেশের কৃষকরা বহু আগেই একটা উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। ভীরুতা সব সময়ে বর্জন করতে হবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে—মাথা থাকবে উঁচুতে তোলা—

বল বীর, চির উন্নত মম শির
এশির নেহারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।

তাঁরা শিখিয়ে গেছেন—'মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'। এই শিক্ষাই যেন সকলকে মানুষ করে।

হিন্দু-মুসলমানের নেতৃত্বে সেদিন হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র কৃষক শ্রেণী, ধনী ও অত্যাচারী হিন্দু-মুসলমান-ইংরাজের সঙ্গে লড়েছিল। ধনী হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অত্যাচারী—দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান সর্বদাই অত্যাচারিত। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই জয়যুক্ত হয়ঃ হিন্দু-মুসলমান কৃষকের মিলিত বিদ্রোহ তারই প্রথম পদক্ষেপ। আজও দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান-জৈন-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রীষ্টানের ঐক্যের প্রয়োজন। সর্বপ্রকার শোষণ দূর করার এটাই একমাত্র পথ।

২ বঙ্গ-বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ

ভারতের মাটিতে যারা প্রথম বসবাস স্থুরু করেছিল সেই মানুষরাই আদিবাসী নামে পরিচিত। তাদেরই বংশধরেরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এখনও ছড়িয়ে আছে। এই আদিবাসীরা অবশ্যই এক জাতির লোক নয়, একই ভাষায় কথা বলেনা বা একই ধর্ম পালন করেনা। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতি বাস করে। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে, পার্বত্য অঞ্চলে, সমতল ভূমিতে এদের দেখা যায়। এক এক গোষ্ঠীতে দলবদ্ধ হয়ে এরা বাস করে। এদের বেশীর ভাগই কৃষিজীবী। এদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা, নিজস্ব ধর্ম আছে।

ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আদিবাসীদের সমাজে সকলেরই ছিল সমান অধিকার। সম্পত্তি যা থাকত, তার মালিকানাও ছিল যৌথ বা সকলের। অধিকার যেমন ছিল সমান, দায়িত্বও ছিল তেমনই সমান। সাধারণতঃ তাদের দলপতি বা মোড়লের নির্দেশই তারা মান্য করতো। সকল উপজাতিরই নিজস্ব ধর্ম ছিল আগেই বলেছি। প্রকৃতির নানা উপাদানকে যেমন পাহাড়-পর্বত, গাছ, পাথর ইত্যাদিকে দেবতা মনে করে পূজা করা হতো। সহজে এরা বসতী তৈরী করে বাস করতে পায় নি। এখনকার শহর, গ্রামের মত, শহর ও গ্রাম তো তখন ছিল না। বন-জঙ্গল কেটে, পাথুরে জমিকে সমান করে, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করে তাদের বসতি পত্তন করতে হয়েছিল, চাষের জমি তৈরী করতে হয়েছিল। বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে হতো বলে সর্বদাই প্রস্তুত রাখতে হতো অস্ত্র-শস্ত্র বাঁটুল, তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বর্ষা, বলোয়া প্রভৃতি। লড়াই করে বাঁচতে

হতো বলে এরা নিজেরাই হয়ে উঠলো প্রচণ্ড সাহসী, দুর্ধর্ষ আর স্বাধীনচিত্ত। জীবনের কোমল দিকটাও ছিল সমান আদরের। সারাদিন প্রচণ্ড খাটুনীর পর সন্ধ্যাবেলা কাটতো নাচে-গানে, বাঁশী, শিঙা, মাদল বাজিয়ে। এই একসঙ্গে বাস করা, কাজ করা আর আনন্দ করার ফলে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একতার ভাব, সংঘবদ্ধতার ভাব। কোন উপলক্ষে জমায়েতের প্রয়োজন হলে ডাক পাঠালেই হতো নির্দিষ্ট সংকেত পাঠিয়ে। বিশেষ কোন বাজনা বাজিয়েও জমায়েত আহ্বান করা হতো। যেমন, সাঁওতাল ও মুণ্ডারা নাগারা বাজিয়ে জমায়েত ডাকতেন।

একথা আমরা জানি যে নানা সময়ে ভারতে বিভিন্ন শক্তি শাসন করেছে। তারা তাদের নিজস্ব নিয়মে রাজ্য শাসন করেছে, কিন্তু এই আদিবাসী উপজাতিদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় কেউ-ই হাত দেয়নি। এদের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন বিনিময় প্রথা একই রকম থেকে গেছে। রাজাকে রাজস্ব দিতে হয়েছে তা-ও সামান্যই, আর দিয়েছে ফসলে। যারা অরণ্যের কোলে থেকেছে অরণ্যের ওপর তাদের অধিকারও থেকেছে। কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি যে ইংরাজ কোম্পানী এদেশে দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা বদলে যেতে লাগলো। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ রসনার খিদের আগুনে ঝলসে গেলো এদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন। ইংরাজের তৈরীকরা ভূমি ব্যবস্থা আদিবাসীদের শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনে কাঁপন ধরিয়ে দিল। আদিবাসীরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই তাদেরই জমির মালিক হয়ে গেল নতুন জমিদারের দল। ক্রমে অরণ্যের দিকে জমিদারের তথা শাসকের হাত প্রসারিত হতে লাগলো। কোন অরণ্য কেটে বসত তৈরী হলো আর কোন কোন অরণ্য হলো 'সংরক্ষিত'—সেখানে সরকার ছাড়া কারো

অধিকার নেই। শাসক, জমিদারের হাত ধরে এলো মহাজন আর ব্যবসায়ীর দল। জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ীর পেষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়ে যেতে লাগলো তাদেরই স্বদেশীয় গরীব, খেটে খাওয়া, সরল মানুষের দল। এরা ঐ শোষকের দল সর্বদাই ইংরাজ শাসকের সাহায্য পেতো,- কারণ এদেশটা শাসন করার কাজে তারাই তো ইংরাজের সাহায্যকারী।

কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় সহজ-সরল মানুষগুলি বেশীদিন চুপ করে সহ্য করতে পারলো না এই অন্যায় আর অত্যাচার। দিকে দিকে বিক্ষোভ জমা হয়ে উঠতে লাগলো—বারুদের স্তূপের মত। তারপর উঠলো অবাধ্যতার ঢেউ। একের পর এক বিস্ফোরণ হতে লাগলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায়। বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতি বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিদ্রোহ করল - চাক্‌মা, খাসী, খন্দ, গোণ্ড, ভূমিজ, রম্পা, হাজো, গারো, পাহাড়িয়া, কোল আর সাঁওতালরা। এই সব বিদ্রোহের মধ্যে খুব বড়, ব্যাপক আর কাঁপন ধরানো বিদ্রোহ হয়েছিল দামিন-ই-কোহ তে, সেখানে বিদ্রোহী হয়েছিল সাঁওতালরা আর হয়েছিল ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেখানে কোল উপজাতি গর্জন করে উঠেছিল বিদেশী শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে। কোল বিদ্রোহ চলেছিল বহুদিন ধরে, অবশ্য একটানা চলেনি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেই এর শুরু। ১৯০১ সালে বীরসা মুণ্ডার ফাঁসির সঙ্গে এর সমাপ্তি ঘটে। সাঁওতাল বিদ্রোহ চলেছিল ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত। এই অল্প সময়েই বিদ্রোহীরা শাসক আর শোষকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই কোল আর সাঁওতালদের বিদ্রোহের কাহিনী – উলগুলান আর হুলের কাহিনী আমরা পড়বো এখানে। সাঁওতালদের কাহিনীই আগে পড়ি।

কোল আর সাঁওতালরা সম্ভবতঃ বিহার অঞ্চলে প্রথম বসবাস করে। সাঁওতালরা নিজেদের বলত 'হড়'। জমি চাষ করে স্বাধীন আর সহজ জীবন কাটাতেই অভ্যস্ত ছিল। এদের প্রধান দেবতা ছিলেন মারাংবুরু।

বিহার অঞ্চল ইংরাজ শাসনাধিকারে এলে সেখানে উৎপীড়ন স্থরু হলো। ফসল ধার্য করা হলো নগদ অর্থে। এ ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয় সাঁওতালরা। তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। খোঁজ করতে লাগল নতুন বাসভূমির। সেই সময়ে বাংলাদেশ ও বঙ্গ-বিহার সীমান্তে জঙ্গল কেটে জমিদারীর সীমানা বৃদ্ধির কাজ চলছে। অনাবাদী, আরণ্য জমিকে চাষের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। ভাগলপুরের কালেক্টর তথা রাজমহলের স্থপারিনটেনডেণ্ট অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের আমলে রাজমহলের পাহাড়তলীতে, ভাগলপুর, বীরভূম আর মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ নিয়ে উপনিবেশ গড়ে তোলার কাজ চলছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে দামিন-ই-কোহ অর্থাৎ পাহাড়ের প্রান্তদেশ। দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া উপজাতিকে ইংরাজ শাসক এই অঞ্চলে বাস করবার আহ্বান জানিয়েছে কিন্তু পাহাড় অঞ্চল ছেড়ে আসতে তারা রাজী নয়। সাঁওতালরা এদিকে আসার জন্য তৈরী হলো। কিন্তু তার আগে তারা একবার জানিয়ে দিল যে পড়ে পড়ে মার খাবার জন্য তাদের জন্ম নয়।

১৭৮৩ সালের শেষ দিক। খাজনা আদায়ের নামে সাঁওতালদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে গেল ইংরেজ কোম্পানীর লোক। অত্যাচার এমন পর্যায়ে উঠলো যে নিরীহ সাঁওতাল আর চুপ করে থাকতে পারলো না। তারা প্রতিবাদ জানালো তিল্‌কা মুর্মু বা বাবা তিলকা মাঝির নেতৃত্বে। তিল্‌কার মুক্তি বাহিনী বর্শা, টাঙ্গি আর বাঁটুল দিয়েই জর্জরিত করে তুললো ইংরাজ সেপাইদের। স্বয়ং

ক্লীভল্যাণ্ড নিহত হলেন বাঁটুলের ঘায়ে। ফলে অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, ভাগলপুরের কাছে তিলকপুরের জঙ্গল ঘিরে ফেললো ইংরাজ বাহিনী। ঐ জঙ্গলের মধ্যে তিল্‌কা ঘাঁটি তৈরী করেছেন। রসদের অভাবে তিল্‌কা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো কিন্তু সাঁওতালরা তাদের ঐ পুরাণো অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো গোলাবারুদে সজ্জিত ইংরাজ বাহিনীর ওপর। মরণপণ সংগ্রাম শুরু হলো, কিন্তু সবাই বুঝলো অসম এই সংগ্রাম। সাঁওতালের লাল রক্তে ভিজে গেল শক্ত মাটি। তিল্‌কা বন্দী হলেন, আর বন্দীর ওপর চললো অকথ্য নিপীড়ন। তারপর হলো তাঁর ফাঁসি।

এরপর অবশ্য সাঁওতালরা শান্ত হয়ে ওঠে। ১৭৯০ সাল থেকেই তারা বঙ্গ-বিহার সীমান্তের দিকে রওনা দেয়। দামিন-ই-কোহতেই তারা তাদের নতুন ঠিকানা করে নেয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে দিল যে, উদ্ধার করা জমির ওপর নতুন কর বসানো হবে না; যত খুশী পরিমাণ জমি চাষ করা যাবে। সাঁওতালরা দলে দলে চলে এলো নতুন ঠিকানায়। চোখে তাদের স্বপ্ন। বুকে তাদের আশ্বাস। তারা ভাবলো তাদের আদি বাসভূমি 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' আর 'চাইচম্পা'য় তারা যে ভাবে সুখে শান্তিতে বাস করত সেই সুখ-শান্তি তারা এখানে ফিরে পাবে। অল্প সময়ের মধ্যেই এরা বহু জমি চাষযোগ্য করে তুললো। ১৮৫১ সালের মধ্যেই গড়ে উঠলো ১৪৩৭টি গ্রাম।

কিন্তু পরাধীন জাতির আবার সুখ শান্তি কি? এল এবার সর্বনাশের কালো দিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। জমিদার হলো জমির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কেইবা আগের ঘোষণার কথা মনে রাখে। জমিদারেরা আবার সাঁওতাল গ্রামগুলি মহাজনদের ইজারা দিতে লাগলো। ভাল জমিগুলি হয়ে

গেল মহাজনদের খাস জমি। অনুর্বর জমি চষে সাঁওতাল কৃষকের বছরের খোরাক জোটে না। বাধ্য হয়ে স্বাধীন কৃষক যায় মহাজনের জমিতে সামান্য মজুরীর বিনিময়ে খাটতে। ঋণ নিতে বাধ্য হয় চড়াসুদে মহাজনের কাছ থেকে। সে ধার কোন দিনই শোধ হয় না। জমি-জমা, বাড়ি-ঘর, গরু-মহিষ সবই চলে যায় মহাজনের দখলে। এর পরে নিজেকেও বিক্রী করতে হতো, অর্থাৎ গোলামী করতে হতো মহাজনের কাছে পুরুষানুক্রমে। উইলিয়াম হান্টারের লেখা থেকে জানা যায় যে কত নিষ্ঠুর ছিল এই মহাজনেরা। কোন সাঁওতালের বাবা মারা গেলে তার সৎকারের জন্য সাঁওতালকে জমিদার বা মহাজনের কাছে কিছু টাকা ঋণ করতে হতো। জামিন রাখার মত জমি বা ফসল না থাকায়, সেই সাঁওতাল লিখে দিতে বাধ্য হতো যে ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে স্ত্রী-পরিবার সহ মহাজনের দাস হয়ে থাকবে। পরের দিন থেকেই সুরু হতো দাসত্ব। এ ঋণ অবশ্য জীবনে শোধ হতো না। শতকরা তেত্রিশ টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের ঋণ কয়েক বৎসরে যে অঙ্কে পৌঁছাতো সে অঙ্ক শোধ করা সাঁওতাল কৃষকের সাধ্য ছিল না। ফলে ঐ সাঁওতাল তার মৃত্যুর সময় পুত্রের জন্য রেখে যেত ঋণের বোঝা। পালাবার চেষ্টা করলে এদের ঘরের যাবতীয় জিনিস, গরু-মহিষ, স্ত্রীলোকদের গায়ের লোহার গয়না পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হতো। জেল আর অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ক্রীতদাস সাঁওতালকে বশে রাখা হতো। আর মহাজনের সঙ্গে ছিল বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর দল যাদের কাজ ছিল সাঁওতালদের ঠকিয়ে সস্তা দরে ফসল কিনে চড়া দামে বাইরে বিক্রী করা। কালিকিঙ্কর দত্ত এই কথা লিখেছেন যে বাঙালী ব্যবসায়ীরা ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বহু অল্প দামে ধান আর সরষে কিনে সিউড়িতে চালান দিত। জানা গেছে যে এই সব অসাধু ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে কেনবার

সময় একরকম আর বেচবার সময় আর একরকম বাটখারা ব্যবহার করতো। দুই বাটখারাই এমনভাবে তৈরী করা হতো যাতে দুবারেই সাঁওতালদের ঠকানো যায়। প্রথম বাটখারার নাম ছিল কেনারাম বা বড় বৌ আর দ্বিতীয়টার নাম বেচারাম বা ছোট বৌ। মোটামুটি ভাবে এরা বিশ পর্যন্ত গুণতে জানতো বলে বিশবার পর্যন্ত গুণে আবার প্রথম থেকে গোনা শুরু হতো। কিন্তু বিশবার পর্যন্ত পৌঁছতই না এরা, হিসেব গোলমাল করে দেওয়া হতো।

এর ওপর শুরু হলো নীলকর সাহেবদের জুলুম। তাদের কথামত খাদ্য-ফসলের জমিতে নীল না বুনলে সহ্য করতে হতো অকথ্য অত্যাচার। নীলকুঠিতে কয়েদ রেখে দৈহিক নিপীড়ন চালানো হতো। বন্দী কৃষকের হদিশই পাওয়া যেত না অনেক সময়।

এদিকে নগদ মজুরীর আশায় অনেক সাঁওতাল গেল রেল লাইন পাতার কাজে। সেখানে মজুরী জুটতো নামমাত্র, কিন্তু উপরি পাওনা জুটতো রেল সাহেবদের অত্যাচার। এই সাহেবরা আবার সাঁওতালগ্রামে ঢুকে হাঁস-মুরগীও চুরি করে নিত।

কিন্তু থানা-আদালত সবই তো আছে, আছেন ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী ব্যাপার দেখাশোনার জন্য, দেওয়ানীর জন্য জঙ্গীপুরের মুনসেফ। কিন্তু হায়, সকলেই লুটের উৎসবের অংশীদার। বিচারকরা জমিদার-মহাজনের ঘুষে পুষ্ট। ইংরাজ লেখক বলছেন সরকার এসবের কিছুই জানতেন না। কিন্তু এও কি সম্ভব! সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব রাজস্ব আদায় ছাড়া কিছুই করতেন না। আর অন্যদের কথা তো আগেই বলেছি।

এইভাবে সাঁওতালের সমাজ জীবনে আর অর্থনৈতিক জীবনে আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। দিকুদের—অর্থাৎ ঐ বিজাতীয়

শাসক-জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ আর ঘৃণা জমেই উঠছে। তিল্‌কার নিশ্বাস বুঝি বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। তিল্‌কার নাগারা আবার বাজতে শুরু করেছে। দিকুদের উৎখাত করতে না পারলেও প্রতিহিংসা অন্ততঃ নিতে হবে।

অঞ্চলের রাজস্ব আদায়-কর্তা সুপারিনটেনডেন্ট তখন জেমস্‌পন্টেট আর দিঘি থানার দারোগা— তাঁরই তাবেদার জবরদস্ত মহেশলাল দত্ত। তাদের চোখের ওপরেই লছিমপুরের পরগণাইৎ বীরসিং মাঝি গড়ে তুললেন এক সংগঠন। এতে যোগ দিলেন বিভিন্ন জায়গার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সাঁওতাল তাঁদের দল নিয়ে। তাদের গতিবিধিতে সন্দিগ্ধ হয়ে মহাজনেরা তাদের বিরুদ্ধে মহেশ দারোগার কাছে অভিযোগ আনল। কিন্তু দারোগা এতে কর্ণপাত না করায় তারা গেল পাকুড় জমিদারের দেওয়ান জগবন্ধু রায়ের কাছে। জগবন্ধু রায় পাকুড় জমিদারীর প্রজা বীর সিংকে কাছারী বাড়ীতে আটক করলেন আর জরিমানা করলেন। কিন্তু বীরসিং জানালেন যে তিনি নির্দোষ আর জরিমানা দেবেন না। বীরসিং-এর অনুচরদের সামনেই তাকে জুতো মারা হলো। সাঁওতাল-মহলের সাঁওতালরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কয়েকটি মহাজন বাড়ি লুঠ করলো।

দামিন-ই-কোহর প্রশাসন কেন্দ্র বারহাইতের কাছাকাছি কুসমা গ্রামে গোচ্চো মাঝি ছিল ধনী সাঁওতাল। এর জমিজমা মহাজনেরা কিছুতেই গ্রাস করতে পারে নি। এইবার তারা সুযোগ পেল। বীরসিং-এর দলের লুঠ পাট যখন চলছিল, সেইসময় কয়েকজন মহাজন গোচ্চোরনামে চুরির অভিযোগ আনল মহেশ দারোগার কাছে। মহেশ দারোগার কাছে কর্তৃপক্ষেরও নির্দেশ এসেছে 'সাঁওতাল-ডাকাত' ধরবার। মহেশ দারোগা গোচ্চোকে ধরে এনে অপমান আর প্রহার করলে। গোচ্চো তখন

গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শান্তিপূর্ণ সাঁওতালদের বাঁধবার মত দড়ি দারোগা কোথায় পাবে সেটাই দেখবার। সে বার অবশ্য গোচ্চো ছাড়া পেলেন কিন্তু পরের বছর গ্রেপ্তার হ'তে হ'ল।

আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকত মহাজন ছিল ভীষণ অত্যাচারী। লিটিপাড়ার বিজয় মাঝি তার কাছ থেকে ১২ ঝুড়ি ধান ধার নিয়ে ১০০ ঝুড়ি ফেরৎ দিয়েও রেহাই পান নি। বরকন্দাজ আর চাপড়াশী নিয়ে কেনারাম তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে আসে। সেবার বিজয় তাদের তাড়িয়ে দিলেও দু'সপ্তাহ পরে কেনারাম সঙ্গে নিয়ে এল কুখ্যাত মহেশ দারোগাকে। বিজয় মাঝির জেল হ'ল আর জেলেই হ'ল মৃত্যু।

একের পর এক অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে থাকে। সাঁওতালরা আর সহ্য করতে পারে না। চারিদিকে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এ সময় তাদের মুক্তির পথ দেখাতে আবির্ভূত হলেন সিদো (সিধু) আর কাণহু (কানু) দুইভাই। তাদের ছোট দুইভাই চাঁদ আর ভৈরবকে নিয়ে। এঁরা ছিলেন ভগনাদিহির মোড়ল চুনার মুর্মুর ছেলে। সিদো আর কাণহু সাঁওতালদের এই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে দৃঢ় সংকল্প হলেন। তাঁরা বুঝলেন যে প্রতিবিধান ক'রার সময় এসেছে। আর চুপ করে থাকা চলবে না। এঁরা আরও উপলব্ধি করলেন যে, প্রথমে সাঁওতালদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করতে যাওয়া ভুল হবে। সকলকে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে। সিদো-কাণহু বুঝেছিলেন যে, ধর্ম মানুষকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। তারা স্থির করলেন ধর্মের নামে জমায়েতের আহ্বান জানানো হবে। প্রচার করা হ'ল—দেশী পোষাক পরা শ্বেত গাত্রবর্ণের ঠাকুর সিদো-কাণহুকে

দেখা দিয়ে ধর্মের লিখন দিয়ে গেছেন। সিদো বাড়ীর উঠোনে ঠাকুরের মূর্তি গড়ে পূজা করলেন। তারপর চারিদিকে পাঠানো হ'ল শাল-গাছের ডাল বা 'গিরা' যা ছিল সাঁওতালদের জমায়েতের ধর্মীয় আহ্বানের প্রতীক। এ আহ্বান উপেক্ষা ক'রার সাধ্য ছিল না কারো। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন। সব কাজ ফেলে, আশায় বুক বেঁধে, তীর, ধনুক, টাঙ্গি যার যা ছিল সঙ্গে নিয়ে দলে দলে সাঁওতাল জমা হ'ল ভগনাদিহির মাঠে। চারশো গ্রামের প্রায় দশহাজার সাঁওতাল এ'ল সেই জমায়েতে। সিদো আর কাণহু পরিচালনা করলেন সেই সভা। তাঁরা সাঁওতালদের ইতিহাস বর্ণনা করলেন; শোনালেন কেমন করে হারিয়ে গেল তাদের স্বাধীনতা। ব্যাখ্যা করলেন দিকু আর তাদের প্রশ্রয়দাতা ইংরেজ সরকারের স্বরূপ। উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে সিদো জানালেন ঠাকুরের নির্দেশ। এই অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না। সমস্ত অত্যাচারীকে সাঁওতাল এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। ভগনাদিহির মাঠে সেদিন হাজার কণ্ঠে সাঁওতাল রাজ কায়েম ক'রার শপথ ধ্বনিত হ'ল।

সিদোর নির্দেশমত কিরতা, ভাদু আর সুন্নো মাঝি তাদের দাবী জানিয়ে সরকার ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট, বীরভূমের কালেকটর ও ম্যাজিষ্ট্রেট, দিঘি ও টিক্‌রি থানার দারোগা আর কয়েকজন জমিদার ও মহাজনের কাছে পত্র পাঠালেন। পনের দিনের মধ্যে উত্তর চাওয়া হ'ল। বলা বাহুল্য উত্তর মেলেনি।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক'লকাতার দিকে এক পদযাত্রা শুরু হ'ল। এক স্মরণীয় পদযাত্রা। হান্টার সাহেব বলেছেন যে, ঐ পদযাত্রায় নেতাদের দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ত্রিশহাজার। পাঁচমোতিয়ার বাজারে এল পদযাত্রীরা। সেখানে দেবতার পূজা ক'রে তারা যাবে ক'লকাতায় সরকারের দরবারে। এমন সময়ে খবর এল যে,

কেনারাম ভগত চুরির অভিযোগ করেছে গভু মাঝি আর হাড়মা মাঝির বিরুদ্ধে আর তাদের জিনিসপত্র ক্রোক করে এমন কি হাড়মার এক ছেলেকে ক্রোক করে সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে। সিদো আর কানহো পদযাত্রার দিক পরিবর্তন করলেন। ২০০০ সাঁওতালের এক জনতা নিয়ে তারা গভু হাড়মাদের ছিনিয়ে নিলেন। মহেশ আর কেনারামকে নামিয়ে দিলেন ঘোড়া থেকে। অপমানিত মহেশ সিদো-কানহুবকে বাঁধবার হুকুম দিলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাজার সাঁওতালের কণ্ঠ গর্জন করে উঠলো—হুল,হুল। ক্রুদ্ধ জনতা মহেশ কেনারামকে হত্যা করে। সময় ১৮৫৫ সাল জুলাই ৭।

এরপর বিদ্রোহের গতি হ'ল দুর্বার। পাঁচক্ষেতিয়ার কুখ্যাত পাঁচ মহাজনকে বিদ্রোহীরা হত্যা করল, নিহত হ'ল খানসাহেব দারোগা, কুরহুরিয়া থানার বড় দারোগা প্রতাপনারায়ণ। অঞ্চলের সিপাইদের কোথাও দেখা গেল না। বারহাইতের রেশমকুঠি, নীলকুঠি জ্বলতে লাগলো। বারহাইত এল বিদ্রোহীদের হাতে।

এই বিদ্রোহে সাঁওতালদের একা চলতে হয়নি। বাংলা ও বিহারের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, কারিগর—কামার, কুমোর, তেলি, গোয়ালা, ভুঁইঞা, বাগ্‌দি, হাড়ি, ডোম, মোমিন—এতে যোগ দিয়েছিল, সকলে যে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল তা নয়, কিন্তু সকলেই পরোক্ষে সাহায্য করেছিল। এই সংগ্রাম ছিল দরিদ্র ও অত্যাচারিতের সংগ্রাম।

ক্রমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভাগলপুর ও বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। নাগারার সঙ্গে শত শত বিদ্রোহী জমা হয় অকুস্থলে, তাদের শৃঙ্খলাবোধ বিস্ময়কর। মেজর বারোজ নিযুক্ত হলেন বিদ্রোহ দমনের কাজে। আর উপেক্ষা করা যায় না বিদ্রোহীদের। বারোজকে

৩

সাহায্য করতে এগিয়ে আসে জমিদার-মহাজন-নীলকরের দল। বিদ্রোহীরা কিন্তু একের পর এক গ্রামে প্রবেশ ক'রে নীলকুঠি. মহাজনদের বাড়ী আর খামার লুট করে নেয়, অগ্নিসংযোগ করে। লক্ষ্মণপুর, লিটিপাড়া, হিরণপুর, পাকুড়, কালিকাপুর, বল্লভপুর, নবীনগর প্রভৃতি জায়গায় কুঠি, কাছারী আর খামার লুট হয়ে যায়, নেতৃত্ব দেন গোষ্ঠো আর সিংরাই। এদিকে সিদো কাণহু পাকুড়ের রাজ বাড়ীতে প্রবেশ করেন,—রাজবাড়ী ছিল শূন্য। বাড়ীটি লুট হল, পরে দীনদয়াল রায় নিজেকে পাকুড়ের জমিদার বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা এই কুখ্যাত মহারাজকে তিলে তিলে হত্যা করে।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট টুগুড সাহেবের বিরাট বাহিনী বিদ্রোহীদের বাধা দিল। সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে বর্শা-টাঙ্গি নিয়ে লড়াই-এ সাঁওতাল বেশীক্ষণ পেরে উঠল না। প্রায় ২০০ সাঁওতাল নিহত হ'ল সিদো, কাণহু আর ভৈরব আহত হলেন। তবুও সাঁওতাল বাহিনী দুমকার দিকে এগিয়ে গেল ত্রিভুবন মাঝি আর মানসিংহের নেতৃত্বে। এদের হাতে কয়েকজন মহিলা সহ একদল ইংরাজ নিহত হ'ল। কুখ্যাত নীলকর লারকিনস্ ও তার দুই ছেলে নিহত হ'ল বিদ্রোহীদের হাতে। ক্রমে বীরভূমের প্রায় সমস্ত অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে এল।

এবার প্রচণ্ড লড়াই—পীরপৈঁতি গ্রামের গিরিসঙ্কটে। এই গিরি সঙ্কটে আরনালা পেরিয়ে সাঁওতাল শিবির। বারোজ আর পুলিশ-প্রধান ইজারটনের নেতৃত্বে নালা পেরিয়ে ইংরেজ বাহিনী শিবিরের দিকে এগোতে থাকে। আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ে ওদের ওপর। পাঁচ ঘণ্টার যুদ্ধে সাঁওতাল জনস্রোতের কাছে হার মানতে হ'ল ইংরেজকে। বিদ্রোহের এ এক মহান জয়। এরপর খয়রা-

শোলের যুদ্ধে লেফটেনান্ট টোলমেইনও পরাজিত হ'লেন।

এবার পূর্বাঞ্চলের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হ'ল বিদ্রোহ দমনের কাজে ইংরাজ সৈন্য পিয়ালাপুর প্রভৃতি চব্বিশ পঁচিশ খানা গ্রাম ধ্বংস করে। মেজর সাকবার্গ হস্তীবাহিনী দিয়ে এর মধ্যে পনেরটি গ্রাম ধ্বংস করেন। রঘুনাথপুরের যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজিত হ'ল। চাঁদ আর কাণহুর বাহিনীকে হারিয়ে বারহাইত পুণর্দখল ক'রে নিল ইংরাজ। ভগনাদিহির গ্রামে অবাধে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হ'ল শিশু, নারী, বৃদ্ধকে। আগুনের ধোঁয়া দেখে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁওতাল পুরুষের দল। তাদের রক্তে ভিজে যায় স্বদেশের মাটি। চারিদিকে বীভৎস অত্যাচার চলতে থাকে। ১৮৫৫ সালের ১৭ই আগষ্ট আত্মসমর্পনের আহ্বান জানানো হয় সাঁওতালদের—এই প্রস্তাব কেউ-ই গ্রাহ্য করেনি। কিছুদিন থমথমে ভাব রইল চারিদিকে। আবার বিদ্রোহ চললো অবাধ গতিতে। ওপার বান্ধা বা ওপার বাঁধ গ্রাম আর থানা লুট হ'ল। তৈরী হ'ল মাটির কেল্লা আর সকলের ঐক্যের জন্য করা হ'ল দুর্গাপুজা। বাঁশকুলি, জয়পুর, কেন্দ্রা প্রভৃতি গ্রাম লুট করা হ'ল। বহু মহাজন হতাহত হ'ল। সংগ্রামপুরের যুদ্ধে চাঁদ পরাজিত ও নিহত হলেন। আর এক যুদ্ধে সিদো, কাণহু হলেন আহত।

এবার সামরিক আইন জারী করলো সরকার। নেতাদের ধরিয়ে দিলে মোটা টাকা পুরস্কার। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত অঞ্চল সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। তবু বিদ্রোহীদের ঐক্যে চিড় ধরে না। চারিদিকে সন্ত্রাসের রাজত্ব। গ্রামে গ্রামে চলে সৈন্যের অত্যাচার। সাঁওতাল বন্দীতে জেল উঠলো ভরে। কোথায়ও নিরাপত্তা নেই, খাদ্য নেই, আছে অত্যাচার। এর মধ্যে চলেছে খণ্ড

খণ্ড যুদ্ধ। এক যুদ্ধে নিহত হ'লেন এক সাঁওতাল নেত্রী। ইতিহাস ওঁর নাম জানে না। ভাগলপুরের কাছে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে ভৈরব নিহত হ'লেন। অশেষ লাঞ্ছনা সইতে না পেরে দুর্বলচিত্ত কয়েক ব্যক্তি সিদো কাণহুর আস্তানা জানিয়ে দিলে ইংরেজরা। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। জুগিয়া হাড়াম লিখেছেন যে সিদো যুদ্ধে নিহত হন, কাণহু ও অপর কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, কয়েকজনের দ্বীপান্তর হয়। এক ইংরেজ লেখক লিখেছেন যে, সংক্ষিপ্ত বিচারের পর বারহাইতে সিদোর ফাঁসি হয়। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী ছটরায় দেশমাঝির বিবরণ থেকে জানা যায় যে সিদো-কাণহু দুজনেরই ফাঁসি হয়েছিল।

এই হ'ল সাঁওতাল বিদ্রোহের রক্তাক্ত ইতিহাস। এই বিদ্রোহ ভারতে ইংরাজ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সতর্ক ইংরেজ শাসক সাঁওতালদের দমন করে রাখবার ব্যবস্থা করলো। দামিন্-ই-কোহর সীমানা বৃদ্ধি করে সাঁওতাল পরগণা সৃষ্টি হ'ল। একজন ডেপুটি -কমিশনারের অধীনে এটি হ'ল একটি নন্ রেগুলেশন জেলা। এদের সমাজ ব্যবস্থায় হাত দেওয়া হ'ল না। মাঝি পরগণাইৎদের সম্মান দেখানো হ'ল।

ইংরেজ শক্তি তার বিপুল ক্ষমতা নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ অসম জেনেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল আদিকালের অস্ত্র নিয়ে নিপীড়িত মানুষের সহায়তা নিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল! আগামীদিনের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিল স্বাধীনতার বীর পূজারী অমর সাঁওতাল।

কোল বিদ্রোহ

এবার আমরা ঘুরে আসি কোলভূমির আঙিনায়। ছোটনাগপুরের রাঁচি, পালামৌ, সিংভূম প্রভৃতি জায়গায় অরণ্যের কোলে কোলে বাস ক'রত অরণ্যের দুলাল কোল জাতির মানুষগুলি। মুণ্ডা, ওঁরাওঁ, হো, খারওয়ার, চেরো প্রভৃতি সম্প্রদায় কোলজাতিরই অংশ। কোলদের প্রধানকে 'মুণ্ডা' বলা হ'ত—এজন্য কোলরা মুণ্ডা নামেই পরিচিত ছিল। বন পরিষ্কার ক'রে এরা খুঁটকাট্টি গ্রাম পত্তন করেছিল,—যে গ্রাম ছিল কাট্টিদার কোলদেরযৌথ সম্পত্তি। জমিদারও থাকত বটে কিন্তু তার কাজছিল গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে খাজনা বাবদ সামান্য পরিমাণ শস্য অদায় করে তার থেকে নিজেদের জন্য রেখে বাকী রাজার ভাণ্ডারে জমা দেওয়া। অরণ্যের কাঠ, বেত, মধু ব্যবহারের অবাধ অধিকার তাদের ছিল। গ্রামের জমিদারদের ও মোড়লকে বলা হ'ত মানকি। পুরোহিত ছিলেন পহান। মুণ্ডা প্রধানদের মান্য করতে হ'ত।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর এসব ব্যবস্থা বদলে গেল – এতো আগেই জেনেছি। নতুন ব্যবস্থায় নতুন জমিঁদারেরা খুটকাট্টি প্রথায় দিল আঘাত। খাজনা দেবার ব্যবস্থা হ'ল নগদ মুদ্রায়—যে ব্যবস্থা কোলরা জানতই না। আস্তে আস্তে কত নতুন বিধি ব্যবস্থা চালু হ'ল। রূপোর বদলে তামার বিনিময়ের একটা বাট্টা দিতে হবে। পচাই আর হাঁড়িয়ার ওপর আবগারি শুল্ক দিতে হবে। হাড়িয়া ছিল পূজারও উপকরণ, খাদ্যও বটে, শুধু নেশার বস্তু নয়। সরকার থেকে লাইসেন্স দিয়ে মদের দোকান বসিয়ে সরল লোকগুলিকে নেশাড়ে ক'রে তোলবার ব্যবস্থা হ'ল। অপরাধ করলে তো জরিমানা হতোই

অপরাধ করেছে সন্দেহ করলেই কোল মানুষকে জরিমানা দিতে হ'ত। কথায় কথায় সেলামী দিতে হ'ত। জমিদারের বাড়িতে পাল পার্বনে টাকা জোগাত কোল জমিদারের পালকি বইত কোল, ঠিকাদারের জরিমানার টাকা দিত কোল। জমিদার মহাজনের সঙ্গে সঙ্গে তলপী বয়ে এখানে ওখানে যেতে হ'ত কোল প্রজাকে। এর ওপর ছিল জমিদার মহাজনদের বাড়িতে বেগার দেওয়া যাকে কোলরা বল'ত বেঠবেগারী, সরকারী কাজেও বেগার খাটতে হ'ত। জমিদার আবার বেশী টাকার বিনিময়ে মহাজনদের জমি ইজারা দিল। মহাজনেরা ভাল জমি খাস দখল করল আর বেশী লাভ করবার জন্য খাজনার হার বাড়িয়ে দিল। কোম্পানীর আদালত ছিল, কিন্তু সেখানে মামলা চালাবার মত বিদ্যে ছিল না এই আদিবাসীদের। তারা সেখানে গেলে ঠকত দু'ভাবে। উকিলরা তাদের ঠকাত আর বিচারকরা তো যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ত তাদেরই দলের। তার ওপর ছিল হিন্দু সন্ন্যাসী আর খ্রীষ্টান মিশনারীর দল। এই দুই ধর্মের প্রভাবে কোলদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে উঠলো। মিশনারীরা লেখাপড়া শেখাত বটে কিন্তু ধর্মের বিনিময়ে। কোল জীবনে মহা হাহাকার পড়ে গেল। আর অভাবের তাড়নাতে সরকারী কাজ পাবার আশায় অনেকে ধর্ম বদলে খ্রীষ্টান হ'ল। অনেকে আড়কাটির পাল্লায় পড়ে দূর আসামের চা বাগানে চলে গেল কুলি হয়ে। স্বাধীন সরল জীবনে এল কুটিলতার ছায়া।

কোলরা এইসব নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে চায়নি, মেনে নিতে পারেনি। নানা সময়ে এরা খণ্ড খণ্ড ভাবে বিদ্রোহ করেছে জমিদার শাসকের বিরুদ্ধে। ১৭৮৯ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত সময়ে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে-এর কোন ইতিহাস জানা নেই। বীর সিং আর মাধো সিং, যাদের নামে কোলরা সম্মান জানাত,

তারা বোধহয় এই সময়কার নেতা।

১৮২০ সালে হো কৃষকরা ফেটে পড়েছিলো বিক্ষোভে। পোড়াহাটের রাজা ঐ সালেই ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করেন। বিপুল পরিমাণ কর ধার্য হ'ল তাঁর ওপর। আর সেই টাকা তুলে নেবার জন্য তিনি হো কোলদের অঞ্চলটিও নিজের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। কোম্পানীও এতে কিছু বললো না। কিন্তু হো কৃষক এই ব্যবস্থা মানলো না। রাজার কর্মচারীরা জোর করে খাজনা আদায় করতে গেলে তাদের হত্যা করলো বিক্ষুব্ধ কৃষক। রাজার কর্মচারীদের নির্বিচারে হত্যা করতে আরম্ভ করায় প্রাণভয়ে বহু কর্মচারী কোল অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পোড়াহাটের রাজা ইংরেজ কোম্পানীর কাছে সাহায্যের আবেদন করলে একদল ইংরেজ সৈন্য কৃষকদের দমন করতে আসে। চাঁইবাসার ময়দানে হো বিদ্রোহীরা তাদের টাঙ্গি, বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে ইংরেজ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অধিকার রক্ষার লড়াই-এ তারা জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যো করে তোলে। কিন্তু বন্দুকের গুলির কাছে টাঙ্গি, বর্শা, তীর-ধনুক কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে? বিদ্রোহীরা অরণ্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে আর মাঝে মাঝে অতর্কিত আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে শত্রুকে। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্য আরও বড় বাহিনী আর কয়েকটা কামান আনা হ'ল। বনের ওপর গোলা ফেলে গাছপালা সাফ করে ফেলা হ'ল। আত্মসমর্পন করা ছাড়া উপায় রইল না বিদ্রোহীদের। কোম্পানীর নির্দেশমত রাজা কৃষকের লাঙ্গল পিছু কর বসালেন। কোল্‌রা বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলো বটে কিন্তু কোম্পানীর ফৌজ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর দেওয়া বন্ধ করে, রাজকর্মচারীদের দেখামাত্র হত্যা করতে থাকে। ১৮৩৬ সালে কোম্পানী

কোল্‌হান অঞ্চল নিজের দায়িত্বে এনে সৈন্য মোতায়েন ক'রে হোদের দমন করে রাখে।

অন্যসব জায়গার মত কোল ভূমিতেও হিন্দু-মুসলমান-শিখ মহাজন জমির ইজারা নিয়েছিল। খাজনার হার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কোল চাষীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল ঐ দিকুদের অত্যাচার। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচি অঞ্চলের ওঁরাওঁ আর মুণ্ডারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। সোমপুর, তামাড়, বন্দগাঁওএ তারা জমা হ'তে লাগলো। দিকে দিকে তীরের সংকেত চলে গেলো। সমগ্র কোল জাতি যেন ফেটে পড়ার অপেক্ষায় ছিল। সিংভূমের হো'রা, মালভূম, হাজারীবাগ, পালামৌর চেরো আর খারওয়ার কৃষক বিদ্রোহ সুরু করে। দিকুদের বাড়ি ঘর খামারে এরা আগুন জ্বালিয়ে দিলো। খেতের পাকা ফসলও নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। বহু দিকু আর তাদের সহচর নিহত হ'ল। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্রোধ আর ঘৃণা এইভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। বিপদগ্রস্ত জমিদার মহাজন ব্যবসায়ীদের বাঁচাবার জন্য ছুটে এল পাটনা আর দানাপুর থেকে কোম্পানীর ফৌজ। অসভ্য জংলী অর্ধোন্মাদ কালো লোকগুলির এত স্পর্ধা আর সহ্য করা যায় না! চারিদিকে খণ্ড যুদ্ধ চলে, ছোটনাগপুর ঊষর মাটি আর্দ্র হয়ে ওঠে দামাল ছেলে-গুলির রক্তে।

কিন্তু এদের আর উপেক্ষা করা যায় না। এদের কঠোরভাবে দমন করা দরকার। ছোটনাগপুরকে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশে পরিণত করা হ'ল একজন লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের অধীনে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে আবার কমিশনারের অধীনে বিহারের একটি বিভাগে পরিণত করা হয়। যে ব্যবস্থাই হোক্ না কেন শাসনের নামে শোষণ আর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধিই পেল।

বরং দিকুদের সঙ্গে এবার যোগ দিল সহকারী পুলিশ আর সৈন্যদল। চারিদিকে যেন তাণ্ডব চলতে থাকে।

আর তাই অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকে হাজার কোলের বুকের ভেতরে। দিকুদের তো তাড়াতেই হবে, ওদের রাজা ইংরেজদেরও তাড়াতে হবে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে তাই এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাহাবাদের কুমার সিংহ বা কুলওয়ার সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। সিংভূম, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থা এরা অচল করে দেয়। পালামৌর দু'জন খারওয়ার সর্দারের নেতৃত্ব খারওয়ার আর চেরোরা কুমার সিংহের দলে যোগ দেয়। এঁদের দু'জনেরই ফাঁসী হয়। পোড়াহাটের রাজা হোদের হাতে বন্দী হয়ে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবে বলে স্বীকার ক'রে মুক্তি পায়। কিন্তু সুযোগ বুঝেই কোম্পানীর কাছে আত্মসমর্পন করে। এরপর মহাবিদ্রোহ শেষ হ'ল, কিন্তু মানুষের বুকের আগুন জ্বলেই রইল। কোলদেরও মনের মধ্যে ভাবনা, আমাদের মুক্তির বাণী কে শোনাবে।

১৮৫৮ সাল থেকে মুণ্ডাদের মধ্যে খ্রীষ্টান আদিবাসী রায়তদের 'সর্দার আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনকারীদেরও দাবী ছিল— ছোটনাগপুর আমাদের, 'বেঠবেগারী বন্ধ কর'। এরা যুদ্ধ করলো না। গেলো আদালতে, নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে। এব্যাপারে মুণ্ডাদের একমাত্র বন্ধু ছিলেন কলকাতার ইংরেজ ব্যারিস্টার জেকব।

কিন্তু আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো। বিদ্রোহ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো সোনপুর, লোধমা, বেলকাড়ি, বাসিয়ায়। ইতিমধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়ে গেছে। সিদো, কাণহুর লড়াই ছাপ দিয়ে গেছে সমগোত্রীয় কোলদের মনে। ১৮৫৭এর বিদ্রোহ হয়ে গেছে। ইংরেজ কোম্পানীর জায়গায় ইংরাজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারত-

ভূমিতে। সরকার এখুনি আর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চায়না। ১৮৬৯ সালে এক আইনে ছোটনাগপুরের ২৫টি পরগণার ২৪৮২টি গ্রামের ভুঁইয়ার আর মাঝিয়ারা হৃত জমির দখল ফিরে পায়। কিন্তু সর্দাররা এতে খুশী নয়। সকলের জমি ফিরে পাওয়া চাই। মুণ্ডারা কেউ-ই খুশী হ'ল না। ১৮৮১ সালে খ্রীষ্টানমুণ্ডাকে শাস্তি দেওয়া হ'ল দোয়েমাতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করার জন্য। কোন চার্চই মুণ্ডাদের সাহায্য করলো না। মিশনারীরা তো এদেশের লোককে স্বাধীনতার অধিকার দিতে এদেশে আসেনি ?

ভারতের কোন জায়গাতেই কোন পরিবর্তন এলো না। ব্রিটিশ সিংহ বুঝলোই না ইতিহাসের ধারা কোনদিকে যাচ্ছে। খাজনার মাত্রা বেড়েই চললো। এর ওপর আছে নানারকম কর, জরিমানা, বেঠ-বেগারী। মহাজনের কাছে ঋণের বোঝা দিনে দিনে ভারী হয়ে উঠতে থাকে। বনভূমি থেকেও অধিকার চলে যেতে থাকে কোলদের। ১৮৮৯ সালে আবার রাঁচি জেলায় কোল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদারী শোষণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার ছুটে আসে সৈন্য। এবার ইংরেজ আপোষ করতে চাইলো, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল খাজনা আর বৃদ্ধি পাবে না, আদিবাসীরা বনজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে পাবে।

কিন্তু দিকুর দল এসব প্রতিশ্রুতি মানবে কেন ? আর ইংরেজ শাসকের কি দায় যে প্রতিশ্রুতি রাখতেই হবে ? ও তো হাঙ্গামা বন্ধ করার রাজনৈতিক চাল মাত্র। দিন কেটে যায় ছোটনাগপুরে একই ভাবে, একই অত্যাচার, একই শোষণ, একই তার রূপ সর্বত্র।

দুঃখের রাতেরও প্রভাত আছে। মুণ্ডাদের মুক্তির দূত বুঝি এবার আসবেন। চুটিয়া পূর্তি গোত্রের লাকারি মুণ্ডা, যাঁর পূর্ব-পুরুষ বাঁকা

আর লকা উলিহাতু গ্রাম পত্তন করেছিলো—সেই লাকারির মেজো ছেলে স্থগানার স্ত্রী করমিরকোলে এল উজ্জল করা ছেলে বীরসা, বীরসাভগবান। বৃহস্পতিবার জন্মেছিলেন, সে কারণে বীরসা নাম। ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সালে বামবা বা চালকাদ গ্রামে তাঁর জন্ম। এবাড়ীর বেশীর ভাগ লোকই খ্রীষ্টান। কালো, ছিপছিপে ছেলেটি জঙ্গলে ছাগল চরায়, বাঁশি আর টুইলা বাজায় আর বোধহয় স্বপ্ন দেখে। গরীব ঘরের ছেলের পড়ার ইচ্ছে দেখে দাদা কোম্‌তা তাকে বুরজুর জার্মাণ মিশনারীদের স্কুলে পাঠান। সেখানে লোয়ার প্রাইমারী পাশ করে চাঁইবাসার আপার প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু পড়া চললো না বেশীদিন। মিশনের সাহেব মুণ্ডাদের 'জোচ্চোর' বলায় প্রতিবাদ করে ওঠে শান্ত ছেলেটি। তাতেই পড়া ছাড়তে হ'ল।

খ্রীষ্টান হলে চাকরী পাবে, জমি পাওয়া যাবে, এসব ভরসায় ভুলে মুণ্ডারা খ্রীষ্টান হয়েছিল। কিন্তু সব ভাঁওতা বুঝে আবার অনেকে স্বধর্মে ফিরে আসে। বীরসার বাবাও ফিরে আসেন আদিম মুণ্ডা ধর্মে। চাকরী করতে বন্দগাঁও এসে জমিদার জগমোহন সিং-এর মুনশি আনন্দ পাঁড়ের কাছে বীরসা হিন্দুধর্ম, বৈষ্ণব মত সম্বন্ধে জানলেন। এতসব ধর্মের কথা জেনে প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে বীরসার মনে একটা ধারণা জন্মালো। তিনি বুঝলেন এসব ধর্মমতের লোকেরা ধর্মের নামেও মুণ্ডাদের শোষণ করছে। খ্রীষ্টান, হিন্দু কেউই তাদের প্রকৃত বন্ধু নয়। তিনি বুঝলেন এক চরম শোষণের মধ্যে তার জাতি পড়ে আছে। মুক্তি এনে দিতে হবে। আর তাঁকেই হতে হবে মুক্তির দূত। সিদোর মত তিনিও বুঝেছিলেন ধর্মের নামে মুণ্ডাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, তার জন্য আগে মুণ্ডাধর্মকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপর স্থরু হবে জমির লড়াই। অধিকার অর্জনের লড়াই।

বীরসা প্রচার করলেন আদি ঈশ্বর শিং বোঙা তাঁকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন অনেক দেবতার পরিবর্তে এক দেবতাকে মান্য করতে হবে। মদ-মাংস ত্যাগ করতে হবে। কুসংস্কার বর্জন করে সুন্দর ও সৎ জীবন যাপন করতে হবে, গলায় 'জানে' বা পবিত্র সূত্র ধারণ করতে হবে। দেবতার পূজা নিজেদেরই করতে হবে। বীরসার প্রচারে মুণ্ডাদের মধ্যে আশার আলো জ্বলে উঠলো, শত শত যুবক 'বীরসাইত' হ'ল। আকাশে বাতাসে যে ত্রাণ কর্তার আবির্ভাবের বার্তা ভেসে আসছিলো—এই বুঝি সেই 'ধরতি আবা'। গ্রামে গ্রামে বীরসার দল প্রচার ক'রে তাঁর ধর্মের উপদেশ, আর তার সঙ্গে নির্দেশ দেয় খাজনা দেওয়া বন্ধ কর। বেঠবেগারী চলবে না। তারা জানায়, প্রলয়ের দিন আসছে। বীরসার দল পরিচ্ছন্নতাও শেখায়। বীরসার নামে উত্তাল হয়ে ওঠে মুণ্ডা জাতি। চালকাদ হয়ে ওঠে পরমতীর্থ। সর্দারদের বীরসা জানিয়ে দেন, তিনি সর্দারদের মত ইংরেজের বন্ধু ন'ন। সব দিকুকেই তাড়াতে হবে।

ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে। সিংভূমের ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে তামাড় থানার হেড কনস্টেবল দুজনকে নিয়ে বীরসাকে গ্রেপ্তার করতে চালকাদে যায়। প্রথমদিন বিপদ বুঝে ফিরে এসে দ্বিতীয়দিন প্রচুর পুলিশ আর ২০০ লোক নিয়ে আবার তারা যায় চালকাদ। কিন্তু মুণ্ডাদের তাড়া খেয়ে ফিরে আসে তারা।

বীরসা তাঁর স্বপ্নের কথা প্রচার করতে থাকেন। স্বাধীন মুণ্ডা রাজ চাই, সাহেব আর তার তাঁবেদার সকলেই মুণ্ডার শত্রু। সকলেরই নিপাত চাই, প্রলয়ের দিন আসছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতবসান বীরসা। হফম্যান সাহেব সাঁওতাল শব্দকোষ তৈরী করতেন, আদিবাসী গ্রামে ঘুরতেন। হফম্যান সরকারকে জানালেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে বা ২৫শে আগষ্ট বীরসা মিশনারীদের হত্যা করবে। জগমোহন সিং আর

তার জাতভাইরাও সরকারের কাছে বীরসার নামে অভিযোগ আনলো।

পুলিশ চুপ ক'রে থাকে না। গ্রামে গ্রামে ঘোরে তারা বীরসাকে আর তার অনুচরদের ধরবার জন্য। পুলিশের সঙ্গে বীরসার সংঘর্ষ হয়, বীরসা পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন। বীরসার খোঁজে পুলিশ গ্রামের পর গ্রাম তছ্‌নছ্‌ করে দেয়। হাতি এনে ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। রাতের অন্ধকারে বীরসার ঘর ঘিরে ফেলে ঘুমন্ত বীরসাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীরসাকে রাঁচি পাঠানো হয়। রাঁচির আদালতে বীরসার বিচারের সময় মুণ্ডাদের প্রচণ্ড ভিড় হয়। জমিদারদের কাজ ছেড়ে মুণ্ডারা চলে যেতে থাকে। বেগার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক দেরী করে বিচার আরম্ভ হ'ল আর বিচারে বীরসার আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল।

প্রায় সমস্ত গ্রামে পুলিশ আর সৈন্য মোতায়েন রাখা হ'ল আর তাদের আশ্রয়ে থেকে খাজনার নামে কৃষকের সর্বস্ব লুট করতে লাগলো জমিদার আর মহাজন। এত অত্যাচার সয়েও খাজনা দিতে অস্বীকার করে কৃষক। জঙ্গলের অধিকার নিয়ে ছোটখাটো সংঘর্ষ লেগেই থাকে। এর ওপর দুর্ভিক্ষ আর মহামারী এসে পড়ে।

জেল থেকে বেরিয়ে বীরসা ব্যস্ত হলেন প্রচারের কাজে। ঠিক করলেন যে, হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রশ্রয়ে দিকুরা অত্যাচার চালায় তাদের ঘাঁটি মন্দিরগুলি ভেঙে দিতে হবে। চুটিয়া আর জগন্নাথপুরের মন্দির ভেঙেদিল বীরসাইতরা। চুটিয়াতে জমিদারের পাইকের সঙ্গে লড়াই-এ বীরসাইতরা হেরে গেল। এবার বীরসা সভা ডেকে বুঝিয়ে দিলেন ধর্ম আর রাজনীতি অভিন্ন। ধর্মের জন্য, প্রার্থনার জন্য গান বাঁধা হ'ল—সে হ'ল রাজনীতির গান। ডোমকা মান্‌কির ঘরে প্রথম সভা হ'ল। এবার কর্মকেন্দ্র হ'ল ডোমবারিতে। চালকাদে তবু মা

করমি চোখের দেখা দেখতে পেতেন ছেলেকে, সেটাও বন্ধ হ'ল। বীরসার মা যে এখন দেশমাতা।

আবার মুণ্ডাদের হাতে রাখার জন্য আশ্বাস দেওয়া হ'ল জমি আর বনের ওপর তাদের অধিকার মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু হায়, ফসল নষ্ট হ'ল, কেউ দেখলো না গরীব কৃষককে। মন্বন্তর এল আবার, খাজনা অদায় করে গেল জমিদার।

১৮৯৯ সালে মুণ্ডারা বড় বড় সভা করলে। ডোমবারি পাহাড়ের সভায় ব্রিটিশ রাজের প্রতীক লালনিশানে সাজানো কলাগাছে তীর মেরে জ্বালিয়ে দিলেন বীরসা আর মুণ্ডারাজের প্রতীক সাদা নিশান তুলে ধরলেন, শুরু হল উলগুলান—বিদ্রোহ। ঠিক হ'ল বড়দিনে বিদ্রোহ শুরু হবে। রাজা, জমিদার, হাকিম, ঠিকাদার, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, খ্রীষ্টান-পাদ্রী সকলকে হত্যা করা হবে! চারিদিকে তীর পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। গান বাঁধা হ'ল 'কাটোং বাবা কাটোং, সাহেব কাটোং কাটোং রারি কাটোং কাটোং।' ২৪শে ডিসেম্বর চক্রধরপুর, খুঁটি, কারা, তোরপা, তামাড়, বাসিয়ায় কুঠি, কাছারী, গীর্জা, মন্দির আদালতে উলগুলানের আগুন জ্বলে উঠলো। ভয়ে জমিদারের দল পালিয়েএল রাঁচি শহরে। রাচির ডেপুটি কমিশনার স্ট্রীটফিলড বন্দগাঁওতে ঘাঁটি বসালেন। বীরসার সন্ধান চাই। এতকেদিতে গয়া মুণ্ডার বাড়ি জমায়েতের খবর পেয়ে দুজন কনস্টেবল আর কয়েকজন চৌকিদার সেখানে যায় কিন্তু কনস্টেবল দুজন মারা পড়ে বিদ্রোহীদের হাতে। স্ট্রীটফিলড এরপর এতকেদিতে এসে নির্বিবাদে গুলি চালালেন গয়া আর তার স্ত্রী পরিজনদের ওপর ঘরে। আগুনও দেওয়া হয়।

এবার মুণ্ডারা সকলে সরকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, খুঁটি থানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। নিহত ও আহত হ'ল কয়েকজন

কনস্টেবল। ষ্ট্রীটফিলড সৈন্য আনালেন খুটিতে। বীরসার নেতৃত্বে সৈল রাকাবের পাহাড়ে শত শত মুণ্ডা জমাহলো তীর, টাঙ্গী, বলোয়া নিয়ে। গাছ আর বাঁশের বেড়ার আড়ালে দাঁড়ালো তারা। ষ্ট্রীটফিলড তাদের আত্মসমর্পনের আহ্বান জানালে উত্তরে এ'ল একঝাঁক তীর। তীর আর রাইফেলের অমক যুদ্ধে মুণ্ডারা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। বীরসার নির্দেশে মুণ্ডা সৈনিক অরণ্যে আশ্রয় নিল। মুণ্ডা শহীদদের মধ্যে কয়েকজন মেয়ে ও পুরুষ সেদিন ছিল।

বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে বহু সৈন্য আনানো হ'ল। অরণ্য এবার ঘিরে ফেলা হ'ল। বিদ্রোহীরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রায় দুমাস ধরে রাঁচি ও সিংভূম অঞ্চলে বিদ্রোহীরা খণ্ডযুদ্ধ চালিয়েছিল। পুলিশ আর সৈন্যদল চারিদিক চষে ফেলতে লাগলো বিদ্রোহীদের খোঁজে। বীরসাকে ধরিয়ে দিলে ৫০০ টাকা আর ডোন্‌কা, মাঝিয়া, বুধু আর পরাণকে ধরিয়ে দিলে ১০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল। চারি-দিকে ঘোরে পুলিশ আর দিকুদের লোক। ত্রাসের সঞ্চার হ'ল চারিদিকে। অসংখ্য মুণ্ডা নিহত ও আহত হ'ল, হাজার হাজার কুটির হ'ল ধুলিস্যাৎ। আর ৫০০ টাকা ইনামের লোভে বীর বীরসাকে ধরিয়ে দিল সেনত্রার জঙ্গল থেকে এদেশেরই কয়েকজন লোক।

বীরসাকে আনা হ'ল বন্দগাঁও। সেখান থেকে রাঁচি। যেখানেই রাখা হয় তাকে, অত্যাচারের ভয় ভুলে ছুটে আসে মুণ্ডার দল। ৫৮১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিচারের কোন কথাই ওঠে না। একলা নির্জন ঘরে হাত, পা, কোমরে শেকল বেঁধে বীরসাকে রাখা হয়। অন্যরাও থাকে শেকলে বাঁধা অন্য এক ঘরে। ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এদের ধরা হয়। বিচার সুরু হয় মে মাসে, চলে ডিসেম্বর অবধি। মে মাসে দেখা গেল ১৪জন মারা গেছে—কিভাবে

কেউ জানলো না। বিচারে ৩ জনের ফাঁসি ৪৪জনের দ্বীপান্তর আর বাকীদের জেল হ'ল। সুস্থ বীরসা কলেরায় মারা গেলেন ৯ইজুন, বিচারের রায় ঘোষণার অনেক আগে। তার মৃত্যুর কারণ কেউ-ই বিশ্বাস করেনি। মৃত্যুর সময়ও তাঁর শরীর ছিল শৃঙ্খলিত। ইতিহাস জানে তিনি ঐ রোগে মরেন নি, আর মৃত্যুর পরেও তাঁকে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিল সরকার? না হ'লে রাতের অন্ধকারে ভরমী নালার ধারে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল কেন তাঁর দেহ? মুণ্ডারীতি অনুযায়ী কবর দিলে হয়ত তাঁর পুনরভ্যুত্থান হতে পারে, এই ভয় হয়ত সরকারের মনে ছিল।

বীরসা শুধু মুণ্ডাদের নয় মানুষকে বাঁচতে শিখিয়ে গেলেন, জানিয়ে গেলেন মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচার নামই বাঁচা। ধর্মোন্মাদ, হঠকারী বলে যতই নিন্দা করা হোক আসল কথা সবাই বুঝেছে মুক্তির মন্ত্র সিদোর মত এই ২৫ বছরের যুবক বীরসা শুনিয়ে দিয়েছেন দেশবাসীকে। বীরাঙ্গনা সালী বীরসার ছাই কোলহানের জমিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন,— বীরসা রয়েছেন তাঁর দেশের মাটিতে, বীরসা রয়েছেন তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে।

মহাবিদ্রোহ—১৮৫৭ ৩

১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়ে ভারতের বুকে ইংরেজ কোম্পানীর নিরবচ্ছিন্ন শাসন আর শোষণ চলতে থাকে। পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে একটু একটু করে ভারতের জমি ইংরেজের কবলে আসতে থাকে আর ভারতের ধন সম্পদ ভারী করে তোলে তাদের কোষাগার। এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শাসন ও শোষণ আর তার সঙ্গে সামাজিক নিপীড়নের পরিণতি ১৮৫৮ সালের হমা-বিদ্রোহ।

ভারতের অর্থসম্পদের দিকেই ছিল ইংরেজের দৃষ্টি। এই অর্থসম্পদ গ্রাস করতে গিয়ে ভারতভূমিই তাদের হাতে চলে এসেছে। আর ঐ সম্পদ নিজের হাতে রাখবার জন্যই প্রয়োজন ভারতীয় জীবনের সব-ক্ষেত্রে ইংরাজদের অনুপ্রবেশ, সে কারণে ভূমি ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা সকল দিকে ইংরেজ পরিবর্তন ঘটাতে লাগলো। ফলে পুরাতন জমিদার হ'ল জমিদারী থেকে বঞ্চিত, স্বাধীন কৃষক হ'ল জমি-চ্যুত, কারিগর হ'ল বেকার। ক্রমে ক্রমে যে গোটা দেশটাই ইংরেজদের দখলে চলে যাচ্ছে একথা বোধহয় ভারতীয়রা উপলব্ধিই করতে পারেনি। আর দেশীয় শাসকরা ক্ষমতা না থাকায় সামরিক বলে বলীয়ান ইংরেজের প্রভাবধীনে এসে পড়েছে নানা চুক্তির মধ্য দিয়ে। কেউ-ই কি বাধা দেন নি! দিয়েছেন টিপুসুলতান মহীশূরে, মারাঠারাও অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল ইংরেজদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। এইভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে এসে গেছে ভারতভূমি এক নতুন বিদেশী শাসকের।

কিন্তু চুপ ক'রে থাকেনি হতভাগ্য বণিকদের দল, এই বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকেই সুরু হয়ে গেছে বিদ্রোহ। ভূমিহীন কৃষক-সমাজ আর জমিচ্যুত জমিদার অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করেছে নতুন শাসকের সঙ্গে। নিষ্ঠুর হাতে দমন করলেও ইংরেজ শাসক বিক্ষোভের আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারেনি।

ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেলের দল ভারতে ক্রমাগতই রাজ্যবৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য কোম্পানী পররাজ্য গ্রাস করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, কিন্তু সে কেবল সাময়িক বিরতি মাত্র ছিল। ওয়েলেসলির অধীনতা মূলক মিত্রতা, আরও নানা চুক্তি এই সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন অস্ত্র। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে এই রাজ্যগ্রাস নীতি একেবারে নগ্নভাবে দেখা দিল। তিনি ঠিকই করে নিলেন যে কোনও প্রকারে—ছলে, বলে, কৌশলে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজাকে সরিয়ে তাদের রাজ্য কোম্পানীর অধীনে নিয়ে আসতে হবে, অপশাসনের অজুহাতে মিত্ররাজ্য অযোধ্যা গ্রাস করে নেওয়া হ'ল, আরেক মিত্র নিজামকে বাধ্য করা হ'ল বেরার প্রদেশ ছেড়ে দিতে। যুদ্ধ করে শিখদের পরাস্ত ক'রে এক ঘোষণার দ্বারা পাঞ্জাব দখল করে নেওয়া হ'ল। আর কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হ'ল স্বত্বলোপ নীতি। ঘোষণা করা হ'ল যে নিঃসন্তান রাজার দত্তকপুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা হবে না। পালকপিতার প্রাপ্য বৃত্তিও তাদের দেওয়া হবে না। ভাগ্যের পরিহাসে এই সময় অনেকগুলি রাজ্যের রাজাই ছিলেন অপুত্রক। দত্তকপুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করেন তারা, জেৎপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করে নেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় বাজীরাও এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

ডালহৌসীর এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি দেশীয় রাজগণের তথা জনগণের

মনে এক গভীর অসন্তোষ ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। ইংরেজের প্রতিশ্রুতির চুক্তির কোন মূল্য নেই একথা সকলেই উপলব্ধি করতে সুরু করে। স্বত্ববিলোপ নীতি ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার প্রতি ও অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক ছিল। এতে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়। রাজ্যচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত রাজগণ স্বভাবতই ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। নানাসাহেব ও তাঁর অনুচর তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসীর বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, নাগপুর আর অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ লুট করা হয়। রাজমর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত করে ইংরেজ ভারতীয়দের মর্যাদায় আঘাত দেয়।

রাজ্যচ্যুত রাজগণ তাঁদের দরবার ভেঙে দিতে বাধ্য হলেন। তাদের মুখাপেক্ষী আত্মীয় স্বজন, সভাসদ আর অসংখ্য সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী হয়ে পড়লো বৃত্তিহীন, চাকুরীহীন। রাজাও অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শিল্পী ও কারিগরের দলও হয়ে পড়লো বেকার। পুরোহিত, পণ্ডিত, মৌলবীদেরও আয়ের উৎস গেল বন্ধ হয়ে কারণ তারা ছিলেন ঐসব দেশীয় রাজগণের আশ্রিত।

জমিদারীচ্যুত জমিদারদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বেন্টিঙ্কের আমলে নিষ্কর জমি খাস দখল করে নেওয়ার ফলে বহু জমিদার ও তালুকদার আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়েন। আবার অযোধ্যা ইংরেজের অধীনে যাওয়ায় ওখানকার তালুকদার শ্রেণী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইসব অসন্তুষ্ট ভূস্বামী সম্প্রদায় ইংরেজ শাসকের প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে।

এদিকে ক্রমাগত অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতের জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়তে থাকে। দিন দিন দুর্দশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে দেশীয় বণিকদের সর্বনাশ তো আগেই হয়ে গেছে।

এই সঙ্গে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমপ্রসার আর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপ ভারতবাসীর মনে গভীর সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার করে। খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। ভারতীয়রা ভাবতে শুরু করে সমস্ত অধিকার কেড়ে নেবার পরে এবার তাদের জাতিনাশ, ধর্মনাশ করা হবে।

ইংরেজ এসেছিল এদেশটাকে নিজেদের কাজে লাগাতে, এদেশকে ভালবেসে বাস করতে তারা আসেনি, তাই ভারতীদের সঙ্গে একটা বিরাট ব্যবধান বজায় রেখে তারা চলত। প্রকাশ্যেই ভারতীয়দের প্রতি তারা অবজ্ঞা দেখাত। ভারতীয়রা ছিল 'নেটিভ' 'কালা আদমী' আর তারা 'রাজার জাত'। ইংরেজ কর্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ ভারতীয়দের আঘাত করত, এই সব কার্যকলাপ এদেশের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ বলে মনে করত এদেশের লোক।

এই সমস্ত কারণের জন্য সারা ভারতেই ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের ভাব ধূমায়িত হতে থাকে। আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে অপশাসনের বিরুদ্ধে। দেওয়ানী পাওয়ার সময় থেকেই বিদ্রোহের সুরু। বিদ্রোহ হয়েছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায়। আসাম, রাজস্থান, বোম্বাইতে হয়েছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, আফিস বিদ্রোহ, চাক্‌মা, গারো, হাজো, ভীল, কোল আর সাঁওতালদের বিদ্রোহ। মহা-বিদ্রোহের আগেই ভারতের এক বৃহৎ সংখ্যার মানুষ যার যার নিজস্ব সমস্যা আর স্বার্থের জন্য জঙ্গলে একসঙ্গে ভাবতে আরম্ভ করলো এবার ইংরেজ শাসনের অবসান চাই। এক নতুন দিক থেকে এই দাবী সোচ্চার হয়ে উঠলো। এবার ১৮৫৭ সালে গর্জন ক'রে উঠলা ইংরেজের অধীনস্থ সিপাহীর দল, তাদের অস্ত্রগুলির মুখ ঘুরিয়ে দিল ওপরওলা ইংরেজের দিকে।

ইংরেজরা ভারত জয় করেছিল যে সেনাবাহিনী দিয়ে, ভারতবাসীকে শাসনে রাখতো যে সামরিক বল প্রয়োগে, সেই সেনাবাহিনী গঠিত হ'ত মূলতঃ ভারতীয়দের নিয়ে! ভারতীয় সৈনিকরাই ছিল এই সামরিক বলের ভিত্তি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ঐ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ভারতীয় সৈনিকদের বলা হ'ত সিপাহী। এদের মাইনে কিন্তু ইংরেজ সৈনিকের চেয়ে কম ছিল। সার্জেন্টের বেশী উঁচু পদে কোনদিনই এদের উন্নতি হ'ত না, অথচ ইংরেজ হ'লে সরাসরি উঁচু পদে চাকরী হয়ে যেতো। সামরিক ছাউনীতে ইংরেজ সৈন্য পেতো আরামদায়ক বাসস্থান, ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কুঁড়েঘর। এই রকম নানা বৈষম্য সামরিক বাহিনীতে ছিল। সব সময়ই ভারতীয় সিপাহীকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত যে গোরা যদি সিপাহীও হয় তবুও ভারতীয়দের থেকে অনেক উঁচুতে তার জায়গা। এর ওপর ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটতো 'নিগার', 'পিগ' বা 'শূকর' প্রভৃতি বিশেষণ। এইসব কারণে সিপাহীরা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল বিক্ষুব্ধ। সিপাহীদের বেশীর ভাগই এসেছিল উত্তর প্রদেশের নানা স্থান থেকে। অযোধ্যা থেকেও বহু লোক সৈন্যদলে চাকরী নিয়েছিল। স্বাভাবতই তারা ইংরেজদের হাতে নিজভূমির নিগ্রহে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। সব সিপাহীই নিজের গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। দেশের অবস্থা, দেশবাসীর নানা অসন্তোষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল তারা। ফলে তাদের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ওয়াহাবী আন্দোলন সিপাহীদের মনের অসন্তোষকে উসকে দিয়েছিল। গোরক্ষপুরের মৌলবী সরফরাজ আলী প্রমুখগণ গ্রামে গ্রামে, শহরে গঞ্জে ঘুরে জনগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে তুলতে লাগলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে। এদের এই প্রচার বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের মধ্যে সাড়া জাগালো।

মহাবিদ্রোহের মহাবিস্ফোরণের পটভূমিকা তৈরী হয়ে গেল। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে খবরাখবর পাঠানো, যোগাযোগ রক্ষা করা হতে লাগলো 'চাপাটি' পাঠানোর মধ্য দিয়ে, শ্রদ্ধার বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণ ঘটালো 'এনফিল্ড কার্তুজ', যে কার্তুজের মোড়কে ছিল গরু আর শূকরের চর্বি মাখানো। ঐ কার্তুজ আবার দাঁতে কেটে নিতে হ'ত। এত এক অকল্পনীয় ব্যাপার। হিন্দুর পক্ষে গরু আর মুসলমানের পক্ষে শূকরের চর্বি নিষিদ্ধ। তবে বুঝি ধর্মনাশ করার জন্যই ইংরেজ এই ব্যবস্থা করেছে। তাহলে তো যে আশঙ্কা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে যে ইংরেজরা ভারতে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, সংস্কারের নামে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে হাত দিতে চায়, নষ্ট করতে চায় ভারতীয় সভ্যতাকে—এসব মিছে নয়। সিপাহীরা এই কার্তুজ ব্যবহার করতে চাইল না, তারা প্রতিবাদ জানালো ঐ কার্তুজ চালানোর বিরুদ্ধে। ১৮৫৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী বাংলার ব্যারাক-পুরের ছাউনীর মঙ্গল পাণ্ডে আর ঈশ্বরী পাণ্ডে প্রথম আপত্তি জানান যে ঐ কার্তুজ তাঁরা ব্যবহার করবেন না। একি অসম্ভব কথা এত বিদ্রোহ! যদি নিজের অধিকার রক্ষা বিদ্রোহ হয়, তবে এ বিদ্রোহ; যদি নিজের সম্মান রক্ষা করতে চাওয়া বিদ্রোহ; যদি বাঁচতে চাওয়া বিদ্রোহ হয় তবে এ বিদ্রোহ। না এ হ'ল মহাবিদ্রোহ।

মঙ্গলপাণ্ডে শুধু নিজেই আদেশ অগ্রাহ্য করলেন না সহকর্মীদের উৎসাহ দিলেন আদেশ অগ্রাহ্য করতে। সামরিক বিচারে শান্তিভাঙ্গার দায়ে মঙ্গল আর ঈশ্বরের ফাঁসি হ'ল। আরও কয়েকজনকে শাস্তি দেওয়া হ'ল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ব্যারাকপুরের রেজিমেণ্ট ভেঙে দিয়ে আগুন চাপা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হ'ল না। কর্মচ্যুত বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে লাগলো নানা দিকে।

চারিদিকে বিক্ষুব্ধ মানুষ যেন অপেক্ষা করেছিল এই বিস্ফোরণের। নানা সাহেব বিভিন্ন রাজ্যচ্যুত, ক্ষমতাচ্যুত রাজন্যবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকলেন। বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের অনুচরবর্গ ভাবলেন এই সুযোগে হয়ত আবার মুঘলদের হাতে গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে।

মে মাস থেকেই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। লক্ষ্ণৌ সিপাহীরা জাতিনাশের ভয়ে শঙ্কিত হয়। তারাও এনফিল্ড কার্তুজ ব্যবহার করতে আপত্তি জানায়। মীরাটের সৈন্যাবাসে বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদ্রোহের তরঙ্গ এখানে প্রবল হয়ে ওঠে, বিদ্রোহীরা জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্তি দেয়। যেখানে ইউরোপীয় দেখে হত্যা করতে থাকে। এরা দিল্লীর দিকে রওনা হ'ল। বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। সিপাহীদের ৬জন প্রতিনিধি আর বেসামরিক কর্মচারীদের ৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী 'সভা' বা জলসা বা 'রাষ্ট্রীয় সভার' ওপরে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হ'ল। বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোগলকে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত করা হ'ল। কিন্তু সম্রাট বা সেনাপতিকে মান্য করা হলেও শাসন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায়, যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি সকল কাজ চালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা জলসার হাতেই দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য দিল্লীর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতা জলসার ছিল না! প্রভাবশালী মুঘল রাজ-কর্মচারীরা এমনকি বেগম জীনৎ মহল পর্যন্ত গোপনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সুরু করেন।

কিন্তু বিদ্রোহ এখানেই থেমে রইলো না। সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে বিদ্রোহ সুরু হ'ল। দিল্লী বিদ্রোহীদের হাতে যাওয়ার পর অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, কানপুর, জৌনপুর, বুলন্দশহর ও অন্যান্য জায়গায় বিদ্রোহ

দেখা দিল। ৬ই জুন কানপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ সুরু করে। নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। কানপুরের ইংরেজ পক্ষ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আলিগড় ইংরেজদের হস্তচ্যুত হ'ল, বদাউনে বিদ্রোহের নিশান তোলা হ'ল। মোরাদাবাদ বিদ্রোহে যোগ দিলে সমগ্র রোহিলখণ্ড থেকে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হ'ল। ফতেগড়ের বিদ্রোহের ফলে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়ার অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। রুড়কি, এলাহাবাদ, ফতেপুর, ফৈজাবাদ সর্বত্রই বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে লাগলো। কানপুরে নানা সাহেব, বেরেলিতে খান বাহাদুর খাঁ, এলাহাবাদে ওয়াহাবী নেতা মৌলবী লিয়াকত আলি সরকার গঠন করলেন। অযোধ্যার বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বিদ্রোহীরা পুরানো নবাব বংশের এক ব্যক্তিকে অযোধ্যার শাসক রূপে ঘোষণা করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। সেখানকার বিদ্রোহের নেতা ছিলেন আহমদ-উদ্-দৌলা। পশ্চিম ও পূর্ব বিহার, ছোটনাগপুরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকলেও ঢাকা ও চট্টগ্রামে এর ঢেউ পৌছায়। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, মালব প্রভৃতি জায়গায়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কয়েকটি অঞ্চলে ছোট-খাট অভ্যুত্থান হয়। পাঞ্জাবের নওসেরা ও অপর কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়। রাজস্থানেও বিপ্লবের ঢেউ জেগে ওঠে। সাতার, দোলাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্বতম রাজগণ বিদ্রোহী হ'ন, হায়দ্রাবাদে মৌলভী আলাউদ্দীন ও রোহিলা সর্দার তুবারজ খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

বিদ্রোহ তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিল ঝাঁসীতে। এখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ থাকায় বিদ্রোহে যোগ দেয়। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রথম দিকে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েই চলছিলেন।

কিন্তু ঝাঁসিতে কয়েকজন ইংরেজ নিহত হ'লে রাণীকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল সেনাপতি হিউরোজ ঝাঁসি আক্রমণ করেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ এইবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের হাতে।

বিদ্রোহে যেমন সিপাহীরা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, রাজন্যবর্গ এগিয়ে এসেছিল, তেমনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিল কৃষক, কারিগর, শিল্পী, মৌলবীর দল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়গণ এ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। মীরাটে একই সঙ্গে সিপাহী আর জনসাধারণ বিদ্রোহ সুরু করে। কৃষকগণ সামরিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেয়। দক্ষিণ হামিরপুরে কৃষকগণ জমির দখল থেকে উচ্ছেদ ক'রে বানিয়া ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের। গ্রামাঞ্চলে জমিদারীচ্যুত পুরাতন জমিদারশ্রেণী দরিদ্র কৃষক ও জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ছোটনাগপুরের পোড়াহাটে হো কোলেরা বিদ্রোহী হয়। পালামৌ জেলার চেরো ও খারওয়ারগণ দু'জন খারওয়ার নেতারঅধীনে সাহাবাদের কুনওয়ার সিংহের সঙ্গে যোগ দেয়।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চুপ করে বসেছিল না। বিদ্রোহের প্রথমে এরা বিদ্রোহী সিপাহীদের শাস্তি বিধান করে। পরে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের হাতে ইংরেজ পক্ষের পরাজয় ঘটলেও ইংরেজগণ খুবই কঠোরভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করে। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে স্যারজন লরেন্সের নেতৃত্বে দিল্লী পুনর্দখল করা হয়। দিল্লীবাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। অসংখ্য পুরুষ-নারী প্রাণ হারায়। বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রাখা হয় ও পরে বিচারের প্রহসন করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। তাঁর

পুত্রদের হত্যা করা হয়। সেনাপতি নেইল বেনারস ও এলাহাবাদে বিদ্রোহীদের পরাজিত করে বহু বিদ্রোহী ও সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। তাঁর এই নিষ্ঠুর কাজে বিরক্ত হয়ে গভর্ণর-জেনারেল নেইলকে সরিয়ে হ্যাভলককে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন। হ্যাভলকও বহু গ্রাম জ্বালিয়ে শত শত মানুষকে নির্বিচারে-হত্যা করলেন। লক্ষ্মৌর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ ছিলেন স্যার হেনরী লরেন্স, শহরের ইংরেজ অধিবাসীরা আর কর্মচারীরা। লরেন্স নিহত হলেন। আউটরাম ও হ্যাভলক কোনওরকমে রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা জয়ী হতে পারেন না। কলিন ক্যাম্বেল বিদ্রোহীদের পরাজিতকরে লক্ষ্মৌ পুনরুদ্ধার করেন। কানপুরে নানাসাহেব বহু ইংরেজকে হত্যা করেছিলেন। এখানে কয়েকজন নারী ও শিশুওনিহত হয়েছিল। হ্যাভলকের কাছে অবশেষে নানাসাহেব পরাজিত হ'লেন। তিনি নেপাল সীমান্তে পলায়ন করেন। বেরেলির বিদ্রোহীদের কয়েক-জন নেতাও পরাজিত হয়ে নেপালে চলে যান।

মধ্যভারতে তাঁতিয়া তোপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইতিমধ্যে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছেন। ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসির দুর্গ দখল করলে লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসি থেকে পালিয়ে যান এবং তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে যোগ দেন। বিদ্রোহ এই অঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করে। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ইংরেজ পক্ষে থাকায় এঁরা দু'জনে সিন্ধিয়াকে পরাজিত ক'রে গোয়ালিয়র দখল করেন। সিন্ধিয়ায় সিপাহীরা বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেয়। নানাসাহের ভ্রাতা শ্রীমন্ত রাওসাহেব গোয়ালিয়রে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হ'লেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য গোয়ালিয়রে উপস্থিত হয়ে স্থুরাট দখল করলো। ব্রিগেডিয়ার স্মিথের বাহিনীর সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁর সৈন্যদল অমিত-

বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে। রাণী নিজে সৈন্যপরিচালনা করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে আহত করলেন। প্রভুভক্ত সেবক রামচন্দ্র রাও তাঁকে গঙ্গাদাস বাবাজীর কুটীরে নিয়ে যায়। সেখানেই রাণীর মৃত্যু হয়। অনুচর মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁতিয়া তোপী বন্দী হ'ন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ইংরেজের বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৮৫৮ সালের শেষের দিকে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমিত হ'ল। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্র জারী করে ইংরেজ কোম্পানীর হাত থেকে এত বড় দেশটার পরিচালনভার নিজের হাতে নিলেন।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'ল নানা কারণে। ইংরেজদের তুলনায় বিদ্রোহীদের সামরিক বল উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিলনা, বিভিন্ন জায়গা থেকে অগণিত ইংরেজ সৈন্য ভারতে এলে বিদ্রোহ দমনের কাজে লাগানো হয়। যুদ্ধে গেরিলা কৌশল ব্যবহার করা হয়নি বা কৃষকদের মারফৎ গ্রামাঞ্চলে যুদ্ধের বিস্তার ঘটানো হয় নি। শুধু শহরাঞ্চলেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজদের সর্বত্র ব্যস্ত রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। বিদ্রোহী নেতারা কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি বা সমগ্র সিপাহীদের সংঘবদ্ধ করতে পারেন নি। বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিংহ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কেউ-ই দিতে পারেন নি। যে বিরাট কৃষক সম্প্রদায় সিপাহীদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল, যে শিল্পী কারিগর শ্রেণী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে সর্বত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় নি বা তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা হয় নি। ভারতীয়দের

একাংশ বিশেষতঃ কয়েকটি প্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ইংরেজসৃষ্ট জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইংরেজদের সহায়তাই করেছিলেন। পাঞ্জাবের শিখ সর্দাররা, গোয়ালিয়রের সিন্ধিরা, যোধপুরের রাজা, ভূপালের বেগম, হায়দ্রাবাদের সালার জঙ, মুঘল রাজকর্মচারীবৃন্দের অনেকে, নেপালের জঙ্গ বাহাদুর রাণা সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। আর ছিল বিশ্বাসঘাতকদের দল। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি স্থান ছাড়া বাকী অংশ ছিল নিশ্চুপ।

এসব সত্বেও এই বিদ্রোহ ছিল বিরাট ও ব্যাপক মহাবিদ্রোহ। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশের বিরাট সংখ্যক লোক জাতিধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে এই বিদ্রোহে সামিল হয়। সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এক ভারতভূমি থেকে বিদেশী শক্তির অপসারণ। সকলেই মুঘল বাদশাহকে কেন্দ্রীয় শক্তি বলে মেনে নিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত গড়ার প্রচেষ্টা করেছিল বিদ্রোহীরা। এক বিরাট সংখ্যক ভারতবাসী এ বিদ্রোহে যোগ দেয়। সিপাহী ও বেসামরিক জনগণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে লক্ষেরও বেশী কৃষক ও সিপাহী নিহত হয়। যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ দেন নি, কিন্তু ইংরেজদের কাজ না করে, রসদ না যুগিয়ে বা অন্যান্যভাবে প্রতিবন্ধকতা করে বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছিল, তাদের সংখ্যাও কম নয়। ভারতীয়দের এ এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। বহুদিনের জমা হওয়া অসন্তোষ ও পুঞ্জ পুঞ্জ বিদ্রোহের পরে বিক্ষুব্ধদের এ এক মহাবিস্ফোরণ আগামীদিনের পথ নির্দেশিকা। ভারতের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম আপেক্ষিক ভাবে ব্যর্থ, বটে কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চির উজ্জ্বল স্বাক্ষর তার রয়ে গেছে।

৪ নীল বিদ্রোহ

নীল চাষকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা ও বিহারে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তাকেই বলা হয় 'নীল বিদ্রাহ'।

কাপড় রাঙাবার জন্য প্রয়োজন এইনীল রং-এর। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল রং তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কৃতহয়নি। নীল গাছের রস থেকে নীল রং তৈরী করে নেওয়া হ'ত। ভারতের এই নীলের চাহিদা দেশে বিদেশে ছিল। প্রাচীন কালে যে ম্যমি তৈরী করতেন মিশরীয়রা তার আচ্ছাদনে তাঁরা ব্যবহার করতেন বাংলাদেশ থেকে আমদানী করা নীল রং। আধুনিক কালে ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পর বস্ত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব চাহিদা হ'ল নীলের।

ভারতের মাটিতে ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসন জাঁকিয়ে বসেছে। এ দেশকে তারা ইংলণ্ডে উৎপন্ন জিনিসের বাজারে পরিণত করেছে। এ দেশের মাটিতে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক ফসল উৎপন্ন করিয়ে নিজের দেশে বা অপরাপর দেশে রপ্তানীর ব্যবস্থাও তারা করে। এমনই একটি বাণিজ্যিক ফসল হ'ল নীল, যার চাহিদা ইংলণ্ডেই বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই বেশী পরিমাণে। বাংলাদেশের নীল ইংলণ্ডে প্রায় ৫ থেকে ৭ গুণ বেশী দামে বিক্রী হতো ইংরেজরা তাই এই ব্যবসাকে পুরোপুরী নিজেদের হাতে নেবার ব্যবস্থা করতে থাকে। দলে দলে ইংরেজ বাংলা ও বিহারে নীলকুঠি খুলতে থাকে। এই নীলকরদের অত্যাচারে বাংলা-বিহায়ের কৃষকরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সরকারের সাহায্য পুষ্ট নীলকর সাহেবরা নীল চাষের একছত্র অধিকারী হয়ে ওঠে।

নীল চাষের ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীল ঠিকাদারদের টাকা ঋণ দিত। ১৭৮৬ থেকে ১৮০২ সালের মধ্যে তারা ৩ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছিল কোম্পানীর কাছ থেকে। এরপর এই ঋণ বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় ধনীদের কাছ থেকেও ঋণ করতে থাকে। নীলকরেরা কৃষককে টাকা দাদনে বা অগ্রিম দিয়ে নীলচাষের চুক্তি করে নিত। এই দাদনে নিলে কৃষক চুক্তি মত নীল চাষ করতে বাধ্য থাকত। গ্রাম্য লোকে যে কারণে ছড়া তৈরী করেছিল 'নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, একবার লাগলে ওঠেনা'। এই দাদন তারা দিত গ্রামের মোড়ল মহাজনের মাধ্যমে। কৃষকেরা মহাজনদের কাছে ঋণের দায় বাঁধা থাকতো বলে বাধ্য হতো তাদের কথা শুনতে, নীলের দাদন নিয়ে নীল চাষ না ক'রে তাদের উপায় থাকত না। মহাজনের মাধ্যমেই নীল পৌঁছোত নীলকরের ঘরে। দাদনের টাকা যে সবসময় কৃষকের হাতে পৌঁছোত এমন নয় মহাজনরাই আত্মসাৎ করে নিত। অবশ্য ফসল ঠিকমত জোগাতে না পারলে নীলকরের অত্যাচার এদের ওপরেও এসে পড়ত, কৃষক তো লাঞ্ছিত হ'তই।

নীলকররা সাধারণতঃ ধনী চাষীদের নিযুক্ত করত গোমস্তা নায়েব, আমীন সুতরাং বেশ উপরি লাভ হতো তাদের। লাভ বেশী দেখে অনেক দেশীয় জমিদারও নীল চাষের ব্যাপারে উৎসাহ হয়ে ওঠেন।

১৮৩৩ সালে ইংরেজরা বঙ্গদেশে জমিদারী কেনবার অধিকারী হলে, অনেক নীলকর প্রচুর জমি কিনে জমিদার হয়ে ওঠে। বড় জমিদারেরা টাকার জন্য ছোট জমিদারেরা নীলকরদের ভয়ে তাদের কাছে জমি বিক্রি করে দেয়। নীলকুঠির অশেপাশের জমি জবরদখল করে নিতেও কুঠির সাহেবরা ইতস্ততঃ করতো না। আইনের সাহায্যে নীলকরেয়া

জবরদস্তি করে কৃষককে নীলচাষের জন্য দাদন নিতে বাধ্য করতো। নীলচাষীরা হয়ে পড়লো ভূমিদাস। ইতিমধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিকে দাসপ্রথা উঠে যায়—সেখানকার রবার বাগিচার মালিকরাও বঙ্গদেশে এসে নীলকুঠির পত্তন করেন। দেশের জমিদারেরা অনেকেই লাভজনক নীল-চাষ আরম্ভ করেছিল বটে, কিন্তু সরকারী সাহায্য পুষ্ট নীলকর সাহেব-দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে পারেনি। ক্রমে বাংলা-বিহারের এক বিরাট অঞ্চলে দোর্দণ্ডপ্রতাপের সঙ্গে নীলচাষ চালাতে লাগলো নীলকর সম্প্রদায়। বাংলা-বিহারকেই এরা তাদের কর্মক্ষেত্র বেছে নিলো। এখানকার উপযুক্ত জলবায়ু আর সস্তা মজুরের জন্য। এছাড়া রাজনৈতিক সুবিধা তো ছিলই।

একবার দাদন নিলে সেই কৃষককে নীল চাষ করতেই হত। চুক্তি পত্রে কি পরিমাণ জমিতে চাষ হবে, নীলগাছের মূল্য কত হবে সব কিছুই লিপিবদ্ধ থাকত। নীলকর নিজের পাওনা কড়ায়ক্রান্তিতে আদায় করে নিত। চুক্তির শর্ত পালন করতে না পারলে চলত অবর্ণ-নীয় অত্যাচার। একবার চুক্তিপত্রে সই করলে সারাজীবন নীলচাষে বাধ্য থাকত চাষী। ঠিকমত চাষ না হ'লে, ভাল জমিতে চাষ না করলে নীলকুঠীর ফটকে আটকে রেখে চালানো হ'ত দৈহিক অত্যাচার। কোন কোন কৃষকের হদিসই আর পাওয়া যেত না। অবাধ্য নীল চাষীর স্ত্রী-পুত্র পরিজনও রেহাই পেতো না নীল করদের হাত থেকে। সরকারী কাগজপত্র থেকেও এই সব অত্যাচারের সম্বন্ধে জানা যায়। নীলকরেরা অন্যের অনাবাদী ও পতিত জমি জবরদখল ক'রে নিয়েছিল। অপরের জমির তামাক, ধান ও অন্য ফসল নষ্ট করে নীলচাষ করিয়েছিল। সরকারী সূত্রে জানা যায় যে, পাওনা আদায়ের জন্য জবরদস্তি আটক বেত্রাঘাত, লুটপাট করা হতো—মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে তাদের অত্যাচারে।

কৃষকের মাথা ন্যাড়া করে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে সেখানে নীল গাছ পুঁতে দেওয়ার ঘটনাও বিরল ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্বোধিনী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "নীলকর সাহেবের স্বাধিকার একাধিপতি স্বরূপ তিনি মনে ক'রলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন···।" গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, কৃষকদের মারপিট করা ছিল নীলকরদের নিত্যকর্ম। এদের অত্যাচারে কৃষক অন্য ফসলও বুনতে পারতো না। এর ওপর ছিল নানাভাবে প্রতারণা করা। এদের অত্যাচার এতই বৃদ্ধি পায় যে, মাঝে মাঝে সরকার নির্দেশ পাঠিয়ে অত্যাচার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাতো, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে নীলকরদের ছিল বন্ধুত্ব। অনেক নীলকরকেই তো অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটও করা হ'তো। তাছাড়া ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে এসে করতে হ'ত—যেটা সাধারণ কৃষকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কোথাও ন্যায় বিচার পাওয়ার উপায়ই ছিল না। নীল চাষের কাহিনী এক অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী সরকারী সূত্রেও তা জানা যায়। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন দেলাতুরু সাহেব, তিনি নীল কমিশনের কাছে বলেছিলেন যে, এমন একটি বাক্স নীলও ইংলণ্ডে পৌঁছায় না, যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টেও এই অত্যাচার নিয়ে কথা উঠেছিল।

[অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার কৃষকসম্প্রদায় নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ ক'রে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে অভ্যুত্থান আরম্ভ হ'ল উনিশ' শতকের গোড়া থেকেই। উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে কৃষ্ণনগরের অত্যাচারী নীলকর আর্মট সাহেব ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে চাষীদের ওপরে চুক্তিভঙ্গের কারণে অত্যাচার শুরু করলে উত্তেজিত কৃষকেরা

দলবদ্ধভাবে তার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করে উত্তর না পেয়ে বাঁশপেটা করে তাকে হত্যা করে। সম্ভবতঃ এটিই নীল বিদ্রোহের সূচনা। কোন কোন ডাকাতের দলও নীলচাষের অত্যাচারে জর্জরিত অসহায় কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ডাকাত সর্দার হরি ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ নীলচাষীর দল লুঠ করেছিল কয়েকটি নীলকুঠি।

এই সময় নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের কৃষকবীর বিশ্বনাথ সর্দার নীল অভ্যুত্থানের নায়করূপে আবির্ভূত হ'ল। বিশ্বনাথ সর্দারকে 'বিশে ডাকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। নীলবিদ্রোহের প্রথম ও প্রধান নেতা ছিলেন এই বিশ্বনাথ। নীলকুঠি লুঠ করে নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার কর্মসূচী তিনি হাতে নিলেন। নদীয়া ও যশোরের বহু কৃষক তার দলে যোগ দিল, বহু নীলকুঠি লুঠ ক'রে আগুন ধরিয়ে তিনি চাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন—অত্যাচার না করার জন্য সাবধানও করেদেন অনেক নীলকর সাহেবকে কেউ কেউ প্রাণভিক্ষা করে বাঁচেন। কিন্তু বিশ্বনাথ যাদের প্রাণ ভিক্ষা দেন তাদেরই একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেন। জেল থেকে বেরিয়ে বিশ্বনাথ বিশ্বাসঘাতককে আক্রমণ ক'রে তার বাংলো লুঠ করেন। ১৮০৮ সালে বিশ্বনাথের ফাঁসী হয়।

১৮৩০-৩১ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা তিতুমীরের নেতৃত্বে আবার নীল আগুন জ্বলে ওঠে। তিতুমীর অত্যাচারী জমিদারকে খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেন এবং দস্যুতার প্রতীক নীলকুঠিগুলি একের পর এক ধ্বংস করতে থাকেন। চুক্তির দলিল পুড়িয়ে চাষীদের মুক্তি দেন তিনি। ২৪ পরগণা ছিল তিতুর কর্মক্ষেত্র। জমিদার ও

নীলকরেরা তিতুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয় আর তাদের সাহায্য আসে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে। নারকেল-বেড়িয়ায় তিতুর বাঁশের কেল্লার রণক্ষেত্রে লড়াইয়ে কয়েকজন সহযোদ্ধা সহ তিতু নিহত হন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো ফরাজী ধর্মমতের অনুগামী দুদু মিঞার নেতৃত্বে। তাঁর নির্দেশে কৃষকরা জমিদার ও নীলকরদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। বিরাট এক অঞ্চলে দুদু মিঞা নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিরাট সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে দুদু মিঞাকে দমন করতে হয়েছিল।

১৮৪৩ সালে ভয় দেখাবার জন্য গোলকনাথ রায় নীলকর কিং সাহেবকে অপহরণ করেন। পরে অবশ্য কিংকে পাওয়া যায়। গোলক-নাথের সন্ধান কিন্তু পায় নি পুলিশ।

নীলকর রেণী খুলনার নানা অঞ্চলে জমিদারী ও পত্তনিদারীর মালিক হয়ে অনেকগুলি নীলকুঠি ও চিনির কল স্থাপন করে। রেণী ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। কি ধরণের অত্যাচার যে সে করতো না, এটাই ভাববার বিষয়। স্থানীয় জমিদার, তালুকদারগণও তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। অবশেষে জমিদার, তালুকদার ও সাধারণ প্রজা একত্রে রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তালুকদারদের নেতা শিবনাথ ঘোষ কয়েকজনকে সঙ্গী পেয়ে রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মনে রাখতে হবে শিবনাথও নীলকর ছিলেন। তবুও নীলচাষীরা তাঁর হয়েই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল। শিবনাথ রেণীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন।

এই সব বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের ঘটনা ঘটলেও নীল-করদের অত্যাচারে ভাঁটা পড়ে নি। ক্রমে ক্রমে বঙ্গের কৃষকরাও ব্যাপক প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত দেশকে আলোড়িত ক'রে তোলে। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ আর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বিক্ষুব্ধ নীলচাষীকে নিশ্চয়ই নাড়া দিয়ে গিয়েছিলো। শাসক শ্রেণীও ভীত হয়ে উঠেছিলো নীল বিদ্রোহের আশঙ্কায়। ১৮৫৯ সালে বারাসতের উদ্বিগ্ন ম্যাজিষ্ট্রেট ইডেন সাহেব ঘোষণা করলেন যে, নীলের জন্য চুক্তি করা প্রজাদের ইচ্ছাধীন। নদীয়া জেলাতেই এই ঘোষণা জারী হ'ল। প্রজাগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীলচাষ বন্ধ করে দিল। তারা নীলকরদের সামাজিক বয়কটেরও ব্যবস্থা করলো। এবং সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগলো নীলকরদের সঙ্গে লড়াইএর জন্য। এ লড়াই মুখোমুখি লড়াই, শুধু প্রতিবাদের নয়, প্রতিরোধের লড়াই। বিদ্রোহীরা তীর, ধনুক, লাঠি, বল্লম, কিছু আগ্নেয়াস্ত্র, পিতলের থালা এমনকি কাঁচা বেলও লড়াইএ ব্যবহার করতে প্রস্তুত হ'ল। অস্ত্রচালনা শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হ'ল। স্ত্রীলোকেরাও প্রস্তুত হ'ল লড়াইএর জন্য। নদীয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগণা, পাবনা প্রভৃতি জেলার প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান কৃষক এই বিদ্রোহে সমবেত হ'ল। বিদ্রোহী কৃষকদের মধ্য থেকেই নেতা আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন যশোরের চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস আর দিগম্বর বিশ্বাস এই দু'ভাই। নীলকুঠির দেওয়ানী ত্যাগ করে এরা বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সর্বস্ব ব্যয় করেন চাষীদের স্বার্থে। আর ছিলেন পলুয়া-মাগুরার শিশির কুমার ঘোষ, সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য, চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়।

নীলবিদ্রোহীদের সমর্থনে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাশীল কিছু ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন। এরা হ'লেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি। এঁরা প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে অবহিত ক'রে তোলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকাখানি যেন নীলবিদ্রোহের মুখপত্র হয়ে উঠেছিলো। ইংরেজ মিশনারীদের মধ্যে কয়েকজন এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। রেভারেণ্ড লঙ্ এই অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে একটি পুস্তিকা রচনা করে প্রচার করেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর যুগান্তকারী-নাটক 'নীলদর্পন' প্রকাশ করেন, ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হ'বার কিছুদিন পরে। এই নাটকের বাংলার কৃষক সমাজের দুর্দশার কথা প্রকাশ পাওয়ায় ইংরেজ শাসক জমিদার গোষ্ঠী ও শাসক-দের তাঁবেদার সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে পড়লো। দীনবন্ধু মিত্র যেন বাংলার সমাজকে কৃষক সমাজের দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার জন্যই এই নাটক রচনা করলেন। লঙ্ সাহেব মধুসূদন দত্তকে দিয়ে এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করালেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ওলটার ব্রেট লঙ্এর বিরুদ্ধে মামলা করেন, বিচারে তার অর্থদণ্ড ও একমাস কারাবাস হয়। জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'নীলদর্পণ' কিন্তু জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও নানা জায়গায় এর অভিনয় হতে থাকে। ১৯০৮ সালে বইটির অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আবার ফিরে আসি বিদ্রোহের কাহিনীতে। বিশ্বাসভাইরা আর অন্যান্য নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠিত করতে লাগলো প্রজাদের। নদীয়া জেলায় নীলচাষীরা জানালো, তারা নীল বুনবে না। বিদ্রোহীরা

প্রতি গ্রামে শাখা বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। জেলায় জেলায় উকিল মোক্তার রাখার বন্দোবস্ত হ'ল। স্থির হ'ল ডঙ্কা বাজিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষকে প্রয়োজনের সময় সমবেত করা হবে। জেলায় জেলায় নীলকুঠি লুঠ হতে লাগলো, আগুন দেওয়া হ'ল লুঠ হওয়া কুঠিতে। কেনী সাহেবের জমিদারীর যত নীল গাছ কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। মুর্শিদাবাদের আওরঙ্গাবাদ কনসার্নের বিরুদ্ধে জমা হ'ল পাঁচশো লোক। মালদহের এগুরুজের কুঠি ধ্বংস হ'ল। এই একই ইতিহাসের একই পুনরাবৃত্তি হ'ল জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে। উত্তর বঙ্গেও এই বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়ে। নীলকর কুঠিয়ালরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যস্ত হয়। মামলা রুজু হয় কৃষকের নামে—কিন্তু সাক্ষী দেওয়ার লোক পাওয়া যায় না। সমস্ত অত্যাচারের সামনে বিদ্রোহীর এক উত্তর—নীল চাষ করবো না, মূল্য ছাড়া ফসল দেবো না। যে দৃঢ়তা, যে দেশপ্রেম নীলবিদ্রোহীরা দেখালেন তার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে শাসক সম্প্রদায় সচেতন হ'য়ে উঠেছিলো। আগেই বলেছি, সাঁওতাল বিদ্রোহ আর মহাবিদ্রোহের শিক্ষাও তাদের মনে ছিল, সে কারণে সন্ত্রস্ত সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য 'নীল কমিশন' গঠন করে। সদস্যেরা সকলেই ইংরেজ ছিল, একজন ছিল বঙ্গীয় জমিদার সভার সদস্য। কৃষকদের কোন প্রতিনিধি এতে ছিল না। তিনমাস ধরে নানা তদন্ত করে বহুজনের সাক্ষ্য গ্রহণ ক'রে কমিশন রায় দেয় যে, নীলকরদের ব্যবসা-পদ্ধতির উদ্দেশ্যে পাপমূলক, ক্ষতিকারক ও ভ্রমাত্মক। নীলকমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পরে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় যে,

রায়তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক নীলচাষ করানো চলবে না। নীলচাষ করা নীল চাষীদের ইচ্ছাধীন।

এই ঘোষণায় নীল বিদ্রোহের জয়ই ঘোষিত হ'ল। বিদ্রোহের সময়েও যশোর, নদীয়া ও অন্যান্য স্থানে নীল চাষ হয় নি। নীলকর সাহেবরাও অনন্যোপায় হ'য়ে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে রাসায়নিক নীলের আবিষ্কারে খাসলী নীলের গুরুত্বও যায় কমে।

ভারতের অন্যতম সফল কৃষক বিদ্রোহ হ'ল নীল বিদ্রোহ। জমিদার মহাজন ও বিদেশী শাসন ও শোষণেয় বিরুদ্ধে এই গণ-অভ্যুত্থান সামন্ত-তন্ত্রের মূলে দেয় প্রচণ্ড আঘাত। পূর্বতন বিদ্রোহগুলির ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্রোহ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান পদক্ষেপ।

৫ পাহাড় অঞ্চলের বিদ্রোহ

স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে অত্যাচারী ইংরেজ শাসক ও তার আশ্রয় লালিত দেশী জমিদার ইজারাদার বর্গের বিরুদ্ধে বহু ছোট ছোট বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল সাধারণ কৃষিজীবী শ্রমজীবি মানুষ। জাতিকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার মত আদর্শ উদ্দেশ্য হয়ত এইসব অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু একতাবদ্ধ হলে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যায় তা তারা সকলকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বাংলা ও বিহারের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ, শান্তিপুরে তন্তুবায় বিদ্রোহ, বাংলার নীল বিদ্রোহের মতই পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, ময়মনসিংহের হাতীখেদা, পাগলপন্থী গারো বিদ্রোহ প্রভৃতি একদিন বিদেশী শাসকদের মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই এই বিদ্রোহগুলি শুরু হয়েছিল। জমিদার ইজারাদারদের শোষণের বিরুদ্ধে চাকমা, গারো, হাজং, কোচ, বাজাই, হদি প্রভৃতি উপজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এরা মোগল শাসনের সময়ও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরাজ আমলেই অর্থলোলুপ বণিক সম্প্রদায়ের হাতে এদের নিজস্ব সুখী, স্বাধীন জীবন বিপর্যস্ত হ'ল।

সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে আগমন শুরু করে। ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা তখন ছিল গ্রাম ভিত্তিক। মোগল শাসনের শেষ দিকে কর আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচারের সঙ্গে কৃষি সম্পর্কে শাসকদের অবহেলা যুক্ত হয়ে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের পথে পা বাড়াল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদার, জমিদার,

গোমস্তারা অবাধে কৃষক শোষণ চালাতে লাগল। এই সময় ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীরও উত্থান ঘটছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজের পক্ষে ইংরেজশক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হ'ল না। এদেশীয় কর্মচারীদের সহযোগীতায় ইংরেজরা অবাধে বাংলা বিহারে লুণ্ঠন ও শোষণ চালাতে লাগল। বাংলার কৃষক সম্প্রদায় নামমাত্র মূল্যে নিজেদের বহু কষ্টার্জিত শস্য বিক্রি করতে ও অধিক মূল্যে বৃটিশ দ্রব্যাদি কিনতে বাধ্য হত। এর ওপর নানারকম করের বোঝা চাপিয়ে বৃটিশ ব্যবসায়ীর দল বাংলার কৃষককে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। উপায়ান্তর বিহীন বাঙালী ভারতীয় কৃষক অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর, বীরভূম, অঞ্চলের মত পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) পার্বত্য অঞ্চলের নিরক্ষর সরল কৃষকরাও এই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬—৮৭)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বলতে বোঝায় চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর কৃষক। এই অঞ্চলে চাকমা, কুকি, মগ প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। কৃষিকার্যই এদের একমাত্র উপজীবিকা। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মোগল যুগেও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পেরেছিল। মোগল শাসকরা এদের কাছ থেকে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলো আদায় করেই ক্ষান্ত হত—তাদের আভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু ইংরেজ শাসনে আর তাদের পক্ষে স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হ'ল না। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর-কাসিমের সঙ্গে সন্ধির ফলে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায়। তারা

জমি সংক্রান্ত নতুন বন্দোবস্ত করতে উদ্যত হল, তখন চাকমাদের পুরনো সমাজব্যবস্থায় হাত পড়ল। কোম্পানী এদের সুযোগ সুবিধা লোপ করে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাইল। দেশীয় কর্মচারীদের সহযোগীতায় ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল আদিম অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার শুরু করল। এই যাযাবর কৃষকরা ঝুম নামক আদিম প্রথায় কৃষিকাজ করত। এরা সুবিধাজনক স্থানে বসতি স্থাপন করে জঙ্গল কেটে জমি কৃষির উপযুক্ত করে নিত। ফসল পাকার পর তারা দল বেঁধে সেই ফসল পাহারা দিত। কয়েক বছর পরে জমির উর্বরাশক্তি শেষ হয়ে গেলে তারা সে স্থান ত্যাগ করে আবার অন্য স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করত ও চাষাবাদ করত। তাদের কোন নির্দিষ্ট জমি না থাকার ফলে জমির ওপর কোন রাজস্ব ধার্য করা যেত না। মোঘল আমলে এরা উৎপন্ন কার্পাস দিয়ে রাজস্ব দিত। বৃটিশ আমলেও সেভাবেই রাজস্ব দেওয়া শুরু হয়েছিল। মোগল আমলে এই কার্পাস কর সংগ্রহের জন্য লোক ছিল। ইংরেজরাও কর অদায়-কারী কর্মচারী বজায় রাখল। এই সমস্ত কর্মচারী ইংরেজ শাসকের উৎসাহে অত্যাচারের দ্বারা পাহাড়িয়াদের উৎপাদিত শস্যের ওপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করল। এই ইজারাদারেরা সংগৃহিত শস্যের চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব মিটিয়ে অবশিষ্টাংশ নিজেরাই আত্মসাৎ করত। এর ফলে পার্বত্য অধিবাসীরা চরম দুর্দশার সম্মুখীন হ'ল। রাজস্ব মিটিয়ে দেওয়ার পর যেটুকু কার্পাস তাদের হাতে থাকত, তার সাহায্যে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ল। তখন বিদ্রোহের রাস্তা বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায়ান্তর রইল না। চাকমা গোষ্ঠীর প্রায় চারটি বিদ্রোহের কথা আমরা জানতে পারি।

(১) প্রথম বিদ্রোহ (১৭৭৬-৭৭) রাজা শের দৌলত ও তাঁর সেনাপতি রামু খাঁর নেতৃত্বে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি চাকমা গোষ্ঠী প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। চাকমা গোষ্ঠী রামুখাঁকে অত্যন্ত মান্য করত। ইংরেজ ও তাদের নিযুক্ত ইজারাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাকমারা একতাবদ্ধ হয়ে রামু খাঁর কথামতো কার্পাসের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করল এবং ইজারাদারদের কার্পাসের গোলা লুণ্ঠন করল। ইজারাদারদের প্রধান প্রধান ঘাঁটি অধিকার করে সমস্ত তুলো আবার ফিরিয়ে নেয়। ইজারাদারদের বহু কর্মচারী নিহন হ'ল। ইজারাদাররা চামকা অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাল। তখন ইংরেজ শাসকরা ইজারাদারদের সাহায্যে সৈন্যদল পাঠাল। চাকমারা পার্বত্য অরণ্যে আত্মগোপন করে সুযোগমত বারবার ইজারাদারদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকল। ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তাদের শাস্তি দেওয়া বা বন্দী করা সম্ভব হ'ল না। বিদ্রোহী চাকমাদের ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে কোন ব্যবস্থা নিতে না পেরে ইংরেজ শাসকবর্গ চাকমাদের বাজারে আসার পথ অবরোধ করল। তারা কার্প্াস বিক্রি করতেও পারল না, কার্প্াসের বিনিময়ে লবণ, ও খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই অর্থনৈতিক অবরোধের কারণেই শেষ পর্যন্ত চাকমারা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হ'ল। ৫০১ মন তুলা বার্ষিক রাজস্ব দেওয়ার শর্তে রামু খাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। এরপর রামুখাঁর আর কোন উল্লেখ ইতিহাসের পাতায় নেই।

(২) দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৭৮২)—প্রথম বির্দ্রোহের অবসানের পরও ইজারাদারদের অত্যাচার বন্ধ হ'ল না। চাকমা দলপতি শের দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জানবক্স খাঁ দলপতি হলেন। এঁরই নেতৃত্বে

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চাকমারা দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করেন। ইংরেজ শাসক ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করে চলল। চাকলা, রাঙ্গুনিয়ার নিষ্কর জমির ওপর খাজনা বসানো হ'ল। রাঙ্গুনিয়ার চাকমা নেতা জানবক্স খাঁ স্বভাবতই বিরক্ত হলেন। তিনি চাকমা অঞ্চলে ইজারাদারদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। প্রায় তিন বছর এই অঞ্চলে কোন ইজারাদার রাজস্ব সংগ্রহ করতে তো পারেননি উপরন্তু খাজনা আদায়কারীদের বাধ্য করলেন তাঁকে খাজনা দিতে। ইনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের সাহায্যে তিনি রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলকে প্রায় স্বাধীন করে তুললেন। ইংরেজ সৈন্য এদের দমন করতে এসে বারবার হেরে যেতে লাগল। তখন ইংরেজ শাসক বিভেদ নীতি ও অর্থনৈতিক অবরোধ—এই দুই অবলম্বন করল। একদিকে যেমন কুকি সৈন্যদের চাকমা গোষ্ঠী থেকে সরানোর একটা চেষ্টা চলল—তেমনি অপরদিকে প্রথমবারের মত এবারও চাকমাদের, সমতলভূমির বাজারে এসে শস্য বিক্রয় ও খাদ্যদ্রব্য কেনার পথ বন্ধ করা হল। এইভাবে শেষপর্যন্ত ইংরেজ শাসক এই বিদ্রোহ দমন করল।

(৩) তৃতীয় বিদ্রোহ (১৭৮৪)-১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জানবকস্ খাঁ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রায় চারবছর বিদ্রোহ চালিয়ে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরাজয় বরণ করেন। তার সঙ্গে এক চুক্তিতে তাকে রাঙ্গুনিয়ার জমিদার আর পার্বত্য অঞ্চলের সর্দার বলে মেনে নেওয়া হয়। তবে, তাকে জমিদারের কর্তব্য মেনে চলতে হবে এই শর্তও আরোপ করা হয়।

(৪) চতুর্থ বিদ্রোহ (১৭৮৭)-শের দৌলত খাঁ নামক দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে চাকমারা চতুর্থবার বিদ্রোহ করে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

চাকমাদের যুদ্ধের প্রথা অনেকটা বর্তমান কালের গেরিলা যুদ্ধের মত। গেরিলা যুদ্ধ হ'ল আড়াল থেকে শত্রুকে আক্রমণ করে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা। ইংরেজদের আক্রমণে চাকমারা পার্বত্য অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করত। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েও ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তাদের নাগাল পেত না। চাকমারা ইংরেজদের ফেরার পথ অবরুদ্ধ করে দিত। পানীয় জল নষ্ট করে দিত। বিষাক্ত তীরের আঘাতে তাদের শেষ করত। ইংরাজদের আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা এতটুকুও ভীত হ'ত না। ইংরেজরাও তাদের সরাসরি পরাস্ত করতে পারেনি। খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে না পারার জন্যই তারা বশ্যতা স্বীকার করেছিল। যতদিন ইজারা প্রথা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমারা বিদ্রোহ চালিয়েছিল। ইংরেজ শাসক হৃদয়ঙ্গম করল যে, ইজারা-দারদের শোষণ, নিপীড়ণই এই বিদ্রোহের মূল কারণ। শেষপর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ইজারা প্রথা তুলে দিয়ে, কার্পাস-করের পরিবর্তে টাকা গ্রহণ করা হবে ঠিক হল। চাকমা সর্দাররা সরাসরি এবং নিয়মিত ভাবে টাকা জমা দিলে খাজনা আর বৃদ্ধি করা হবে না। অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি ইংরেজ সরকার রক্ষা করেনি। স্বাধীনচেতা, আদিম অশিক্ষিত চাকমা গোষ্ঠী সুসভ্য, সুশিক্ষিত ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু পূর্বেই।

ময়মনসিংহে হাজং বিদ্রোহ বা হাতীখেদা আন্দোলন—

হাজং, চাকমাদের মতই আর এক উপজাতি। এদের বাস ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড়ের সমভূমিতে। এরা একদিকে যেমন কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, নির্ভীক, অপরদিকে তেমনি সরল, বিশ্বস্ত,

বন্ধুবৎসল। ষোড়শ শতাব্দীতে সোমেশ্বর সিং (পাঠক) নামক এক সৈনিক এই হাজংদের সাহায্যে পরাক্রমশালী গারো সর্দারদের পরাজিত করে সুসঙ্গ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এক সুসঙ্গ জমিদার রাজা কিশোর পার্বত্য অঞ্চল থেকে হাতী ধরার কাজে হাজংদের নিযুক্ত করেন। এইসব হাতী তারা ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করতেন। এর ফলে তারা যে শুধু অর্থের দিক দিয়ে ধনী হতেন তা নয়, খ্যাতি ও মর্যাদাও পেতেন। প্রত্যেক বছরই তাই বেশী সংখ্যায় হাতী ধরার জন্য হাজংদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হত। পরবর্তী কালে জমিদারগণ হাতী ধরার কাজে বাধ্যতামূলক বেগার প্রথা প্রচলন করেন।

কৃষিজীবী হাজংগণ তাদের চাষবাসের কাজ ফেলে বহু বিপদের সম্মুখীন হয়, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে হাতীখেদার কাজ করতেন। গভীর অরণ্যের মধ্যে হাতীর খাদ্য কলাগাছ ও ধানের চাষ করা হত। খাদ্যের লোভে বন্যহস্তীর দল সেই স্থানে প্রবেশ করলে প্রবেশ পথ বন্ধ করে তাদের বন্দী করা হত। তারপর পোষা হাতী বা কুনকী হাতীর সাহায্যে বন্য হাতীকে পোষ মানান হত। সুতরাং হাতী ধরার কাজ একেবারেই সহজসাধ্য ছিল না। হাজংরা বহুবারই এই কাজ করতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু জমিদাররা এ ব্যাপারে কর্ণপাতও করেনি। উপরন্তু নানাভাবে অত্যাচার শুরু করেছিল। শেষপর্যন্ত বাধ্যতামূলক বেগার প্রথা চালু করার চেষ্টায় হাজংদের ধৈর্যের বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাজংরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন হাজং সরদার মনা। গারো কৃষকরাও এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। ক্রুদ্ধ জমিদার মনা

সর্দারকে বন্দী করে হাতীর পায়ের তলে পিষ্ট করে তাকে হত্যা করে। এর ফলে হাজং ও গারো বিদ্রোহীদল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এরা একযোগে মুসঙ্গের জমিদারের পাইকপেয়াদাকে আক্রমণ করে। হাজং মাহুতরাও হাতীদের ক্ষিপ্ত করে জমিদার বাহিনীর দিকে চালিত করে। বিদ্রোহীরা হাতীখেদার স্থানগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। প্রায় পাঁচ বছর এই বিদ্রোহ চলেছিল। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল অত্যাচারী দেশী জমিদারের বিরুদ্ধে, যারা ইংরেজের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছিল। হাজং কৃষকগণ কর্তৃকই এই বিদ্রোহ মূলতঃ পরিচালিত হয়েছিল। তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল গারো উপজাতির কয়েকজন সর্দার। বহু হাজং গারো মানুষ এই বিদ্রোহে হয় নিহত হয়েছে, নয়ত নিখোঁজ হয়েছে। তবে, এই বিদ্রোহের পর বাধ্যতামূলক হাতী ধরা বা হাতীখেদার কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ (১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩, ১৮৩৭-৮২)

গারো উপজাতি ময়মনসিংহের উত্তরদিকে গারো পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা। গারো পাহাড় প্রচুর ছোট বড় পাহাড়ের মিলিত এক দীর্ঘ শ্রেণী। এই অঞ্চলে গারো উপজাতির সঙ্গে হাজং, কোচ, বানাই, ডালু, প্রভৃতি নানা উপজাতির বাস। এরা সকলেই গারো বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। গারোদের উপজীবিকা ঝুম পদ্ধতিতে কৃষিকার্য উৎপাদিত ধান ও তুলার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করত। জমিদারবর্গ গারো উৎপাদিত শস্যর ওপর খুব উচ্চ হারে রাজস্ব ধার্য করলে গারোদের সঙ্গে তাদের বিরোধিতা শুরু হয়।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হাজং ও গারো উপজাতির লোকেরা করম শাহ নামে এক ফকিরের কাছে 'পাগল পন্থী' বা বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। মানুষে মানুষে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সত্যনিষ্ঠা ছিল এই ধর্মের মূল-কথা। অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে এই ধর্মও তাদের সাহায্য করেছিল।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ভূপতি নামে এক গারো সর্দার পার্বত্য অঞ্চলের সকল উপজাতিকে নিয়ে স্বাধীন গারো রাজ্য স্থাপনের একটি পরি-কল্পনা করেন। কিন্তু জমিদারের ষড়যন্ত্রে তার নিজের দলের লোকই তার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠায় তিনি সেই অঞ্চল থেকে পলায়ন করেন। অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে গারো পার্বত্য অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য তিনি ইংরেজদের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু জমিদাররা ক্রুদ্ধ হবে এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেনি। গারো স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল না। পরবর্তীকালে, ইংরেজ ও তার তাঁবেদার দেশী জমিদারদের সঙ্গে গারো উপজাতীয় গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাঁধল।

প্রথম পাগলপন্থা বিদ্রোহ (১৮২৫-১৮২৭)

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাগলপন্থী ধর্মগুরু করম শাহর মৃত্যু হয়। এরপর টিপু গারো নামে আর এক ব্যক্তি নতুনভাবে এই ধর্ম প্রচার শুরু করেন। দলে দলে গারো উপজাতির মানুষ এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। 'সব মানুষই সমান' এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল। এই সময় জমি-দারের অত্যাচারও অমানুষিক আকার ধারণ করল। রাজস্ব সংগ্রহের নামে তারা নিজেদের অর্থলালসা চরিতার্থ করতে শুরু করল। সরকারী রাজস্বের ওপরও নানা বে-আইনী রাজস্ব ধার্য করে তারা মাত্র বারো টাকার জায়গায় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আদায় করত। ১৮২৪

খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্ম যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করার নামে জমিদারবর্গ আরো বেশি করের বোঝা উপজাতি গোষ্ঠির ওপর চাপিয়ে দেয়। এই বে-আইনী করের বোঝা ও তা আদায়ের জন্য অমানুষিক অত্যাচারই গারো বিদ্রোহের প্রধান কারণ।

এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সাম্যবাদী পাগলপন্থী টিপু সরদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বকমু, দ্বীপচাঁন, গুমাবু সরকার প্রভৃতি বিদ্রোহী নায়ক। টিপু সরদার প্রথমেই খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য বল প্রয়োগ করলে টিপুর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ ভাবে জমিদার বাহিনীকে আক্রমণ করে। শেষপর্বন্ত গরদরিপার যুদ্ধে বিদ্রোহীদের জয় হয় ও জমিদাররা সেরপুর শহর ত্যাগ করে সপরিবারে কালীগঞ্জের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেম্‌পিয়ার সাহেবের কাছারি বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বিদ্রোহী কৃষকগণ সেরপুর শহর দখল করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বাধীন রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে সেরপুরের রামনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন—

বকমু জজিয়তি করে, দ্বীপচাঁন কালেক্টর
নথীপত্র পেশ করে গুমান্থ সরকার।

অর্থাৎ বিদ্রোহী নেতা বকমুর হাতে ছিল বিচার বিভাগের ভার, দ্বীপচাঁন কালেক্টর বা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গুমান্থ সরকারের হাতে ছিল দলিল পত্র রক্ষা করার দায়িত্ব। টিপু সরদার প্রায় দু'বছর এই স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে প্রায়ই ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের ছোট ছোট যুদ্ধ ঘটেছিল। সেই এবং সব যুদ্ধেই ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর থেকে আগত সুবিশাল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। একজন দারোগা মাত্র দশজন সৈন্যের সাহায্যে

গড়দরিপায় প্রবেশ করে সুকৌশলে টিপু সরদারকে বন্দী করেন। বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে কারারুদ্ধ অবস্থায় টিপুর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮৩২-৩৩)

টিপু গারোর নেতৃত্বে প্রথম পাগলপন্থী বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাগলপন্থী গারোগণ সহজে মাথা নত করতে চাইল না। তারা গোপনে আবার একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিল। এইবার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন টিপু গারোরই এক সহযোগী গুমানু সরকার। উজির সরকার নামে আরও একজন গারো সর্দার গুমানুকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু গুমানু উজিরের মিলিত বিদ্রোহের পরিকল্পনা ইংরেজ শাসকের অজানা রইল না। সেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গুমানুকে গ্রেপ্তার করেন। ঢাকার কমিশনার সাহেব মনে করলেন যে গুমানুর গ্রেপ্তার গারো উপজাতিকে আরও ক্রোধান্বিত করে তুলবে, তাই অবিলম্বে তিনি গুমানুকে মুক্ত করেন। অন্যদিকে গুমানুর সহকর্মী উজির সরকার গারোদের সংঘবদ্ধ করে বিদ্রোহের আয়োজন শেষ করে ফেলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে দ্বিতীয় পাগল পন্থী বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় জমিদারদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। শুধু যে জমিদারের কাছারি লুঠ হয় আর তাদের পাইক গোয়েন্দা, সরকারী পুলিশের ওপর আক্রমণ হয় তা নয়, জমিদার পক্ষের গারোদের সর্বস্বত্ব লুঠ করা হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পাগলপন্থী বিদ্রোহের নেতা হিসাবে দুজন গারো সর্দারেব নাম পাওয়া যায়-জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামে। এরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও কঠিন মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। এরা বিদ্রোহী গারোদের দুভাগে ভাগ করেন। জানকু পাথর এক ভাগের নেতৃত্ব দিয়ে

সেরপুরের পশ্চিমে কড়ৈবাড়ীতে এবং দোবরাজ পাথরের অধীনে আর এক দল নলিতাবাড়ীতে ঘাঁটি স্থাপন করে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দুই বাহিনী মিলিতভাবে সেরপুরের জমিদারের বাড়ী ও কাছারির ওপর আক্রমণ চালায় ও লুণ্ঠন করে। জমিদার, পরিবার ও কর্মচারী সমেত পলায়ন করে প্রাণে বাঁচেন। বিদ্রোহীরা সেরপুরের থানাও আক্রমণ করে ও পুলিসদের পরাস্ত করে। সেরপুর শহর সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের দখলে আসে। ইংরেজ সরকারের কোন কর্মচারীই এই শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবার সাহেবের নির্দেশে তৎকালীন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গেরেট সাহেব বিদ্রোহীদের দমন করতে অগ্রসর হন। কিন্তু গেরেট সাহেবের পক্ষে সেরপুর একেবারেই নিরাপদ ছিল না। বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ী আক্রমণ করলে, তিনি সেখান থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। তারপর সরকারী পুলিশবাহিনী ও জমিদারের পাইক পেয়াদারা একত্র করে আবার বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দোবরাজ পাথর এই মিলিত বাহিনীকে তার নলিতাবাড়ী ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হতে দেখে সসৈন্যে বিনাযুদ্ধে নলিতাবাড়ী ত্যাগ করে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করল। এত সহজে নলিতাবাড়ী অধিকার করতে পেরে গেরেট সাহেবের বাহিনী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। নলিতাবাড়ীতে জমিদারের কাছারি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তারা উৎসবে মত্ত হয়ে উঠল। তাদের সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় দোবরাজ পাথর সসৈন্যে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরেজ বাহিনী হতচকিত অবস্থায় পলায়ন করল, বহু লোক প্রাণ হারাল। দোবরাজ পাথর কয়েকজন শত্রুপক্ষীয় লোককে বন্দী করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেল।

এত কমসংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হওয়া

অসম্ভব একথা উপলব্ধি করে ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবার জামালপুর থেকে অধিকসংখ্যক সৈন্য চেয়ে পাঠান। বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ শক্তি যে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল, এই পত্র থেকে তা জানা যায়। বিদ্রোহীরা সেরপুর দখল করে কর সংগ্রহ করছে ও প্রচুর সংখ্যক লোকের সমাবেশ করছে, বিষাক্ত তীর ধনুক ও কিছু বন্দুকে সুসজ্জিত হচ্ছে এ সমস্ত সংবাদে ইংরেজরা বিচলিত হয়ে উঠছিল।

ক্যাপ্টেন মিলের পরিচালনায় প্রায় দেড়শ সৈন্য জামালপুর থেকে সেরপুরে এসে পৌঁছয়। ক্যাপ্টেন মিলও তার সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্বের ভার দেন লেফটেনাণ্ট ইয়ংহাজব্যাণ্ডকে। ক্যাপ্টেন মিল জানকু পাথরের ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করে সেদিকে অগ্রসর হন। জানকু তার চার সহস্র তীর ধনুক-ধারী সৈন্য নিয়ে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। এই সংবাদে বিরক্ত ইংরেজ বাহিনীকে আবার মিলিত করে জানকুকে আক্রমণ করার জন্যে ক্যাপ্টেন মিল তৈরী হল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে ক্যাপ্টেন মিল তার সৈন্যদলকে নিয়ে গারো পাহাড়ের নিম্নভূমিতে গিয়ে পৌঁছান। পরদিন প্রভাতে জানকুর ঘাঁটির ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালান হয়। এই আক্রমণের জন্য জানকু ও তার বাহিনী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তারা পর্যুদস্ত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে ইংরেজরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেও তাদের কোন সন্ধান পায়নি।

তখন ক্যাপ্টেন মিল ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে তিনদিক দিয়ে বিদ্রোহী সৈন্যদের ঘিরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিক দিয়ে ইংরেজ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। পশ্চিমগামী বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী সৈন্যদের অচিরাৎ সাক্ষাৎ

ঘটে উভয়পক্ষের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী জয়লাভ করে। কারণ তারা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ছিল। বিদ্রোহীরা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারা আবার ৮ই মে তারিখে ক্যাপ্টেন মিলের সৈন্যদলকে আকস্মিক আক্রমণে হতাহত করে পালিয়ে যায়।

এর পূর্বের দিনই ইয়ংহাজব্যাণ্ডের সৈন্যদলও বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও বিদ্রোহীরা পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে। পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের দুর্গের সন্ধান করলেও ইয়ংহাজ-ব্যাণ্ড সে জাতীয় কোন দুর্গের বা বিদ্রোহীদের কোন ঘাঁটিরই সন্ধান পান না—অথচ বারবার বিদ্রোহীরা তাদের চকিত আক্রমণে হতাহত করে পাহাড় অঞ্চলে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত বন্দী গারো সৈন্যরা অমানুষিক অত্যাচারের ফলে দোবরাজ পাথরের গৃহের সন্ধান দিতে বাধ্য হয়। দোবরাজ পাথরের গৃহ থেকে বন্দী জমিদারী কর্মচারীদের উদ্ধার করে গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

ইংরেজ সরকার এবারেও প্রত্যক্ষভাবে গারোদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। তারা অত্যাচারের পথই বেছে নেয়। জান্‌কু পাথর ও তার সাহায্যকারী অন্যান্য গারো সর্দারদের গৃহ ভস্মীভূত করার আদেশ দেওয়া হয়। এই ধরণের শাস্তি ও পীড়নের কারণে শেষপর্যন্ত পাঁচজন নেতাসহ বহু বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করে। জান্‌কু ও দোবরাজকে গ্রেপ্তারে সাহায্য করলে তাদের পুরস্কার ও মুক্তি দেওয়া হবে, এই শর্তে তারা তাদের নেতাদের গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান দেয়। কালভদ্র ও পণ্ডিত মণ্ডল নামে আরও দুজন সর্দার ১৩ই মে দলের লোকের সঙ্গে ধরা পড়ে। এইভাবে একের পর এক বিদ্রোহের নেতারা, ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ধৃত হয়। জান্‌কু দোবরাজেরে সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তার ঘাঁটি ত্যাগ করে। জুনমাসের মধ্যে প্রায় সকল বিদ্রোহী নেতাই আত্মসমর্পণ করে কিন্তু জান্‌কু পাথর ও দোবরাজ পাথরকে ইংরেজ সৈন্য কোনদিনই গ্রেপ্তার করতে পারেনি—আশ্চর্যের কথা এই যে, তাদের দুজনের কোন সন্ধান আর কখনই পাওয়া যায়নি।